ডিসেম্বর ১৯৮৮

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
শতাব্দীর বিস্ময়
ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর
শতবর্ষ

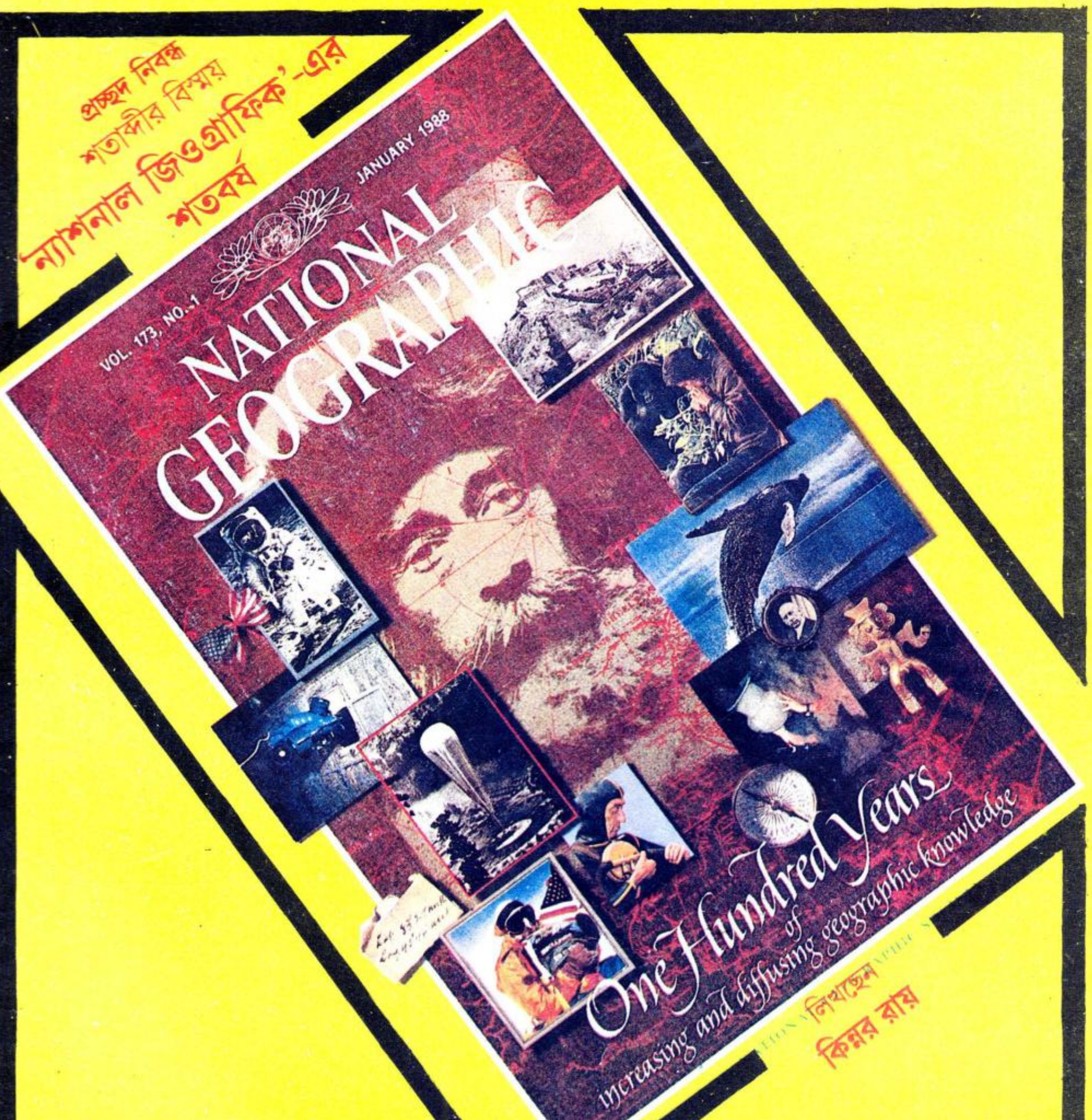

লিখছেন
কিন্নর রায়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

9ম সংখ্যা
ডিসেম্বর 1988

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : জিওগ্রাফিকে অভিজ্ঞতা ॥ সমরজিৎ কর 7

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' এর শতবর্ষ ॥ কিন্নর রায় 11

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : ভূতুড়ে বাঁক ॥ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় 39

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতিমূলক রচনা আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হবে।

গাছপালা : পাতা কেন ঝরে ॥ সমীর কুমার ঘোষ 47

কমপিউটারের কলা-কৌশল :
কম্পিউটার কিভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে ॥ সৌম্য মিত্র 15

পরিবেশ ও আমরা : অরণ্য ॥ সৌমেন্দু পাল 20

ইলেকট্রনিক্স : ইলেকট্রনিক্সস্ কুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 19

জীবজন্তু : সাগর কুসুম ॥ শৈবাল কুমার গুহ 21

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা : বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ কুমার দাস 37
জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 53

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : বিজ্ঞানীর টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায় 51

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা : ইন্টারফেরন ॥ সুজিৎ মুখোপাধ্যায় 49

ছড়া : জলে আছে অক্সিজেন ॥ কমল চক্রবর্তী 50

জানা-অজানা : জয়দেব ঘোষ, সৌরভ দে, জয়ন্ত মণ্ডল 10

ফিচার ও ছবিতে গল্প : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার 43 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55 : কুইজ কনটেস্ট 56 : শব্দকূট 57 : সুপার কুইজ কনটেস্টের উত্তর 58

আবিষ্কারের গল্প : কলম কে আবিষ্কার করেন ॥ লতিকা দত্ত 22

ধারাবাহিক রচনা : 'নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 27
অলৌকিকের আঙিনায় ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31

কার্টুন : শৈল চক্রবর্তী 30

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 : কুইজ কনটেস্টের উপহার 60 : কম খরচে হাই ভোল্টেজ ॥ দেবকুমার রায় 61 ব্যাটারী 'চার্জার ॥ রাজা মুখার্জি ও আদিত্য মণ্ডল 62 : বলতে পার কেন ॥ সুধাংশ পাত্র 63 : বিজ্ঞান সংবাদ 66

প্রচ্ছদ : রবীন বসু ॥ অন্যান্য ছবি : অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
কলকাতার পাখি
লিখবেন
অজয় হোম

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

চিঠিপত্র

মজার অঙ্ক

গত জুন (88) সংখ্যায় মজার-অঙ্ক শিরোনামে লেখক জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা দিয়ে গোটা অঙ্কশাস্ত্রটাই বদলে ফেলা যায়। এটা কখনই সম্ভব নয়। কারণ—উনি লিখেছেন 'দুটি রাশির পাওয়ার সমান ও তাদের সার্বিক মান সমান হলে রাশি দুটি সমান হবে' তাই যদি হয় তাহলে $X^4 = Y^4$ সবসময়ই সত্যি। কিন্তু না, এখানে $X = 4$ এবং $Y = 4$ ও হতে পারে, তা হলেও $X^4 = Y^4$ হবে। যদি কোন যুগ্ম সংখ্যা পাওয়া থাকে তাহলে রাশি দুটির মান সমান নাও হতে পারে! যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা যায় তাকেই বলে যুগ্ম সংখ্যা। $0 \div 2 = 0$, $\because$ O ও একটি যুগ্ম সংখ্যা

এর থেকে প্রমাণ হয় যে $703 \neq 11$ সম্ভব নয়।

ঋত্বিক গুহ খড়্গপুর মেদিনীপুর

ব্যাকটেরিয়া কি প্রাণী

গত জুলাই ১৯৮৮ সংখ্যায় অয়ন মজুমদার ও সৌমেন মজুমদার মহাশয়ের "ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন-উত্তর" রচনাটিতে (11) নং প্রশ্নটিতে কিছু ভুল চোখে পড়ল। লেখকদ্বয় বলেছেন যে ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলে। ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে কিছু কিছু যৌন জননে সক্ষম। প্রাণীদের যৌন জনন হয়। তাছাড়ায় শুধু উদ্ভিদ নয় প্রাণীরাও ভিটামিন (A, D K) সংশ্লেষে সক্ষম। সেই জন্য ব্যাকটেরিয়াকে আবার প্রাণীও বলা যায়। এই সকল কারণে বর্তমানে ব্যাকটেরিয়া কে উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসাবে গণ্য না করে "প্রোটিস্টা" (Protista) নামক একটি আলাদা জগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি আমার চিঠিখানি আপনাদের পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রশাশিত হবে।

গোপাল সেন, কল-9

বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে

আমরা নিম্নস্বাক্ষর কারীবৃন্দ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় জানুয়ারি 1988 সংখ্যা থেকে একটি নতুন ধারাবাহিক রচনা পরিবেশিত হচ্ছে—'বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে'। এই লেখাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, সুস্থযুক্তির পরিপন্থী

এবং পাঠক পাঠিকাকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে সক্ষম। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় এমন বিজ্ঞান বিরোধী রচনা প্রকাশ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

অভিরূপ দাসগুপ্ত ও অন্যান্য, কল-2

উচ্চতম আগ্নেয়গিরি ও বৃহস্পতির উপগ্রহ

মে' 88 সংখ্যায় কুইজ গ্রেড II-এর একটি প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীর উচ্চতম আগ্নেয়গিরি কোনটি? এর উত্তরে জুলাই সংখ্যায় বলা হয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনালোয়া। এই উত্তরটি সম্পূর্ণ ভুল। আমি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উচ্চতম তিনধরণের অর্থাৎ সক্রিয়, ঘুমন্ত ও নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির নাম উচ্চতা ও অবস্থিতি দিলাম।

i) পৃথিবীর উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (active volcano)—অ্যান্টোফল্লা। উচ্চতা 21, 162 ft বা 6450 মিটার। এটি আর্জেনটিনায় অবস্থিত।

2) পৃথিবীর উচ্চতম ঘুমন্ত (dormant) আগ্নেয়গিরি—লু লাইলাকো (22,057 ft বা 6723 মিটার) এটি চিলি ও আর্জেনটিনার সীমানায় অবস্থিত।

3 পৃথিবীর উচ্চতম নিবাপিত (Extinct) আগ্নেয়গিরি সেরো অ্যাকোনগুয়া (22,834 ft বা 6960 মিটার)। এটি আর্জেনটিনার আন্দিজ পর্বতমালায় অবস্থিত।

যেখানে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনালোয়া আগ্নেয়গিরি উচ্চতা 13,681 ft বা 4,170 মিটার।

এছাড়া জুন' 88 সংখ্যায় ক্যুইজ গ্রেড I এর একটি প্রশ্ন ছিল বৃহস্পতির কটি উপগ্রহ আছে? এর উত্তরে আগস্ট সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে বারটি। কিন্তু বর্তমানে বৃহস্পতির 16টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের নাম হল 1979 J3, 1979 J1, গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো, ইউরোপা, আইও, হিমালিয়া, অ্যামালথিয়া, ইলারা, থিবি, প্যাসিপি, কার্মি, সিনোপে, লিসিথিয়া, অ্যানাঙ্কে ও লেডা।

প্রসঙ্গত বলি, যে কোন বিজ্ঞান পত্রিকায় সাম্পতিকতম তথ্য দেওয়া একান্ত উচিত। লেখক হয়ত কয়েক-বছর আগেকার তথ্য নিয়ে বর্তমানে চালাচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। লেখকের এইসব সাম্প্রতিক তথ্য নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 24 পরগনা (সাউথ)

জানা অজানা

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফত আগস্ট 1988 সংখ্যায় "জানা-অজানা" বিভাগে জানলাম যে নয়নতারা ও তুলসী গাছের অসাধারণ গুণ।

তুলসী গাছের পাতা থেকে কর্পূর ও পরে সর্দি-কাশির সিরাপ যা বহুল ব্যবহৃত তা কি আদৌ সর্দি-কাশি নিরাময় করে? এর বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতখানি?

এটা কি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিকতথ্যনির্ভর ? জানালে সবিশেষ উপকৃত হবো।

"পড়ে গিয়ে মুচকিয়ে ও প্রচণ্ড যন্ত্রণার প্রশমন" এক্ষেত্রেও আমার একই বক্তব্য। তাছাড়া দেখলাম উভয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম প্রজাতি (Species) ও (Geenus) গণ বড় হরফে লেখা হয়েছে। এটা কি আদৌ সঠিক? আমার মনে হয় বিন্যাস-বিদ্ধির (Taxonomy) আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী প্রজাতি (Species) এর নামটি ইংরাজী অক্ষরে লেখা বাঞ্ছনীয় এবং উহার আদ্যক্ষরটি ক্ষৌর্থ হরফে (Small letter) লিখতে হবে।

দুর্গা প্রসন্ন মুখার্জী, সাম + ডাকঘর = নিকুঞ্জপুর, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-722144

মডেল নির্মান

আমি আপনাদের "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের" একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। এই ম্যাগাজিনের বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় বিষয়টি হল 'নিজে নিজে কর' বিভাগের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মডেল গুলি। কিন্তু মডেল গুলির কানেকশন কত সহজ ভাবে যোগ করে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় তার বিবরণ জাতে চাই। মডেল-গুলি তৈরি করতে কত খরচ পড়তে পারে বা মডেল তৈরির জিনিষ-গুলি কোথায় কিনতে পাওয়া যায় ইত্যাদি। আমার একটা অনুরোধ, যদি কোন বন্ধু 'নিজে নিজে কর' বিভাগে 'অডিও এমপ্লিফায়ার'র 35 ওয়াট সম্পন্ন ও IC দিয়ে তৈরি সম্বন্ধে বিস্তারিত সহ আলোচনা করেন তা হলে খুবই উপকৃত হব। আমার প্রস্তাবটি নিয়ে দয়া করে একবার আলোচনা করুন।

রাজেশ গিরি রচিত 'মডেল বানাতে গিয়ে' লেখাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। পরবর্তী সংখ্যাতে এই রকম বিভিন্ন কম্পোনেন্টর এর বিবরণ লেখার জন্য অপেক্ষা করব।

শ্রীদেব জ্যোতি সাধু পোস্ট-বনগ্রাম জেলা — উত্তর 24 পরগণা।

পড়াশোনা-ত্রিকোণমিতি

জানুয়ারি-88 সংখ্যায়, মাননীয় অসীম মুখোপাধ্যায় এর একটি অংকের ভুল ধরেছেন উত্তম মণ্ডল। কিন্তু তার মধ্যে কিছু ভুলও আছে। হয়ত উক্ত অংশটি তাঁর ভুল না, ছাপার ভুল। তবে অংশটি নিম্নোক্ত হওয়া উচিৎ।

যেমন তিনি লিখেছেন,

$$h = 3x \quad ..(1)$$

পুনরায় ABD সমকোণী ত্রিভুজ

$$\tan 30° = \frac{h}{x+60}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\surd 3} = \frac{h}{x+60}$$

$$\rightarrow x+60+h\surd 3 = 23, \ (1)$$ এর সাহায্যে।

বা = 30 মিটার।

এই ভাবে হবে,

$$\tan 30° = \frac{h}{x+60}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\surd 3} = \frac{h}{x+60}$$

$$\rightarrow x+60 = h\surd 3$$

$$= \surd 3x \cdot \surd 3 \ldots (1)$$ এর সাহায্যে

$$= 3x$$

$$\rightarrow x - 3x = -60$$

$$\rightarrow -2x = 60$$

$$\rightarrow x = 30$$ মিটার।

টিংকু দে, পাথারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম।

পড়াশোনা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের June-88 সংখ্যার, 5 পৃষ্ঠায় শ্রী অসীম ব্যানার্জী মুর্শিদাবাদ থেকে জানিয়েছেন যে ইলেকট্রন কণিকার ব্যাস $5 \cdot 6 \times 10^{-13}$ cm। সাধারণতঃ এই মাপই আমাদের স্কুলের পাঠ্য বইতে দেওয়া হয়। কিন্তু এর accurate মাপ হল $5 \cdot 598 \times 10^{-13}$ cm। অর্থাৎ শ্রী বিপ্লব ব্যানার্জীর দেওয়া উত্তর সঠিক। উৎসাহী পাঠকদের জানাই 10^{-13} cm—এই মাপটির নাম Fermi metre।

ঐ সংখ্যারই 15 পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় অমর নাথ রায় Neon Gas সম্পর্কে লিখেছেন —'কোনও বাল্ব বা নলের ভিতর কম বায়ু চাপে রেখে তার মধ্যে Neon gas পূর্ণ করলে সেই বাল্ব বা কাচ নল কমলা লেবু বর্ণের আলো নির্গত করে।' কিন্তু ভুলবশতঃ তিনি লিখতে ভুলে গেছেন সেই নলের ভিতর দিয়ে Electric discharge পাঠানোর কথা। পাঠক-দের জানিয়ে দিই এটি ছাড়া আলো নির্গত হওয়া অসম্ভব।

কৌশিক দত্ত, ডি-2 57, জে, সি, বোস এভিনিউ, দুর্গাপুর।

জুনে-88 সংখ্যায়, 15 পাতায়, পড়াশোনা বিভাগে 'নিওন' শীর্ষক রচনায় লেখক অমরনাথ রায় বলেন নিওনের আবিষ্কার তারিখ 7ই জুন 1988 এবং তিনি আরও বলেন যে গভীর জলে ডুবুরিরা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে অক্সি-জেনের সাথে নিওন গ্যাস ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু যতদূর সম্ভব নিওনের আবি-ষ্কারের দিন 7ই জুন 1888 এবং ডুবুরিরা অক্সিজেনের সাথে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে থাকেন (শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যাতে করে 'Caisson' নামক রোগ না হয়।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সোনারপুর, 24-পরগণা।

ইলেকট্রনিকস্ এর কলাকৌশল

সেপ্টেম্বর 88 সংখ্যায় প্রকাশিত সুজয় গোস্বামীর (হাওড়া) পত্রের উত্তরে জানাই ঠিক যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'কম্পিউটারের কলাকৌশল' রচনাটি শুরু করা হয়েছিল, সুজয় বাবুর চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম আমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে চলেছে।

সুজয় বাবুর মতো অনেকেরই কম্পিউটারের বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা রয়ে গেছে। সেই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যই এই ধারাবাহিক রচনাটির প্রকাশ।

ব্লক ডায়াগ্রামের ভুল সম্পর্কে অভিযোগটির জন্ম সম্ভবত কম্পিউটার বিষয়ে কেবল মাত্র তাত্বিক জ্ঞানের ফল।

মাইক্রো কম্পিউটার প্রযুক্তিতে আমরা কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদরা CPU বলতে একই সঙ্গে কন্ট্রোল ইউনিট, এরিথমেটিক লজিক ইউনিট, রেজিস্টার কাউন্টার এবং টাইমিং সারকিট বুঝে থাকি। ঠিক যেমন একটি মটোর গাড়ির ইঞ্জিন বললে তার মধ্যে ইঞ্জিন ব্লক সিলিণ্ডার, পিস্টন ট্যাপেট, কারবুরেটর প্রভৃতি সমস্ত যন্ত্রাংশ একত্রে বোঝায়। একটি মটোর গাড়ির ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকার সময় পুরো ইঞ্জিনটিকেই একটি ব্লক এঁকে দেখাতে যেমন কোনো ভুল হয় না, ঠিক তেমনি মাইক্রো কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রামে CPU কে একটি আলাদা ব্লক হিসেবে দেখাতেও কোনো ভুল হয় না।

প্রসঙ্গত বলি, সুজয়, আপনার মতে যেটি 'সঠিক ব্লক ডায়াগ্রাম সেটিই কিন্তু ভুল! CPU এর যে ব্লকটি আপনি এঁকেছেন তার মধ্যে মেইন মেমরি ইউনিটটি আসবে না।

যাইহোক, এই ব্যাপারে আর একটি কথা সবারই মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি কোম্প্যানির CPU এর কার্যপ্রণালী এবং ব্লক ডায়াগ্রাম বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ আপনি যদি কোনো 8 bit CPU, 16 bit Pile line architechture CPU এবং 64 bit Parallel Prcesstug arechitechture এর ব্লক ডায়াগ্রাম পাশাপাশি রেখে মেলাতে চেষ্টা করেন, তবে দেখবেন কোনোটিই কোনোটার সঙ্গে মিলছে না।

ঠিক এই কারণেই বেশীর ভাগ কম্পিউটারের বইতে এবং আমার রচনাতেও কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রামে CPU এর আভ্যন্তরীণ ব্লক না দেখিয়ে গোটা CPU কেই একটি ব্লক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আগস্ট 88 তে প্রকাশিত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি লেখাটিতে উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছেন অমিয় মণ্ডল (বাঁকুড়া) এবং বাসুদেব আচার্য (বাগুইআঁটি)। এছাড়া সেপ্টেম্বর 88র ছবি উল্টে পাল্টা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন সুজয় গোস্বামী। আপনাদের সবাইকেই জানাই—আপনাদের বক্তব্যই সঠিক। যে ত্রুটি গুলি দেখেছেন, সে গুলি কোনোটাই লেখকের গাফিলতির দরুন হয়নি। এগুলি নিছকই মুদ্রণ প্রমাদ। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, শুধু ওই দুটি সংখ্যাতেই নয়, অন্যান্য সংখ্যাতেও এরকম ছোটো খাটো মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। কিন্তু যে কোনো Technical বা বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকার এক দম নির্ভুল ভাবে ছাপাতে গেলে প্রুফ রিডারকেও বিজ্ঞানের ছাত্র কিম্বা বৈজ্ঞানিক হতে হয়। বিদেশী জার্নাল গুলিতে লেখকই প্রুফ দেখেন। এ ব্যবস্থা এদেশে চালু না করা গেলে এই ছোটো ছোটো অসংগতি গুলিকে পাঠকদের নিজ গুনে মাফ করে দিতে হবে।

সৌম্য মিত্র, 15/2 রাণী শঙ্করী লেন কল 26

ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ক্লক

এবারের শারদীয়া "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে" প্রকাশিত আমার লেখা ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ক্লক নামক প্রোজেক্টে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছাপার ত্রুটি দেখলাম যেগুলি প্রোজেক্ট তৈরীর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এখানে ত্রুটিগুলি সংশোধন করে দিলাম যাতে কোন পাঠক বন্ধুর প্রোজেক্ট তৈরিতে অসুবিধে না হয়।

শারদীয়া কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 156 পৃষ্ঠার নিচে Fig-2 বলে সার্কিটটা ছাপা হয়েছে সেটি আসলে Fig-5 এর সার্কিট। আবার Fig-5 বলে ছাপা হয়েছে 158 পাতার ওপরে Fig-2 এর সার্কিট। এই সার্কিট দুটি স্থান পরিবর্তন করবে। Fig-2 অর্থাৎ UM 3484 দিয়ে তৈরি Musical past-এর IC-এর 8নং পিন-এ নেগেটিভ সাপ্লাই দিতে হবে। এছাড়া 159 পাতায় লেখার শেষ প্যারাতে Fig-1 যেটা ছাপা হয়েছে ওটা হবে Fig-8, Fig-1 এ FND 500 এর জায়গাতে 23 × 270Ω লেখা আছে। আসলে প্রতিটি FND 500-এর a, b, c, d, e, f এবং g প্রতি পয়েন্টের Sereis-এ 270Ω Resistor লাগাতে হবে। এছাড়া ছাপার যে সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে আশা করি সেগুলি মডেল তৈরিতে কোন অসুবিধা করবে না।

নিলমলেন্দু বিকাশ পাত্র, চামরাইল. হাওড়া,

জিওগ্রাফিকে অভিজ্ঞতা

সমরজিৎ কর

বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বটে। প্রতিষ্ঠানটির আসল নাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি। তবে ওয়াশিংটনে দেখলাম, অত বড় নাম বলার দরকার নেই। শুধু 'জিওগ্রাফিক' বললেই অনেকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবে, ওই তো। চলে যান—17 নম্বর এবং এম স্ট্রিট, উত্তর পশ্চিম। পিন কোড (ও দেশে বলা হয় ডি. সি) কত যেন? হ্যাঁ; ওয়াশিংটন ডি. সি. 20036। অত সব ভাবতে হবে না, যেন কোন ট্যাকসি চালককে বলুন 'জিওগ্রাফিক', সে-ই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে। কথাটা যে মিথ্যে নয়, পথে পা দিতেই তা বুঝতে পারলাম। দেখলাম, তিনটি জিনিস নিয়ে ওয়াশিংটনের মানুষের বড় গর্ব—এক: লাইব্রেরি অভ্ কংগ্রেস অর্থাৎ সেখানকার জাতীয় পাঠাগার। পৃথিবীর যত রকম বই, যত ভাষায়, তার প্রায় সবই পাওয়া যায় সেখানে। দুই: স্মিথসোনিয়ান, যাকে বলা চলে সংগ্রহশালার সাম্রাজ্য। তিন: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক।

মার্কিন সরকারের অতিথি। তাই ট্যাকসি নিতে হয় নি। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি দেখার ব্যবস্থা করলেন আমার গাইড এবং শিকাগোর একটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ জন কুন্নিলনান। বলছিলাম না, বিচিত্র অভিজ্ঞতা? দেশে বসে আমরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা পড়ি। অমন ছাপা, অমন দুষ্প্রাপ্য ছবি, বিভিন্ন বিষয়—বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির উপর অমন সুখপাঠ্য রচনা—এবং সবচেয়ে বড় কথা, অমন নির্ভরযোগ্য তথ্য কম পত্রপত্রিকাতেই মেলে। আর তা যোগাতে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি, অর্থাৎ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি যে কী বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন। ওঁদের ওখানে না গেলে ভাবাই যেত না!

ওঁদের দপ্তরে যেতেই দেখা হল কেণ্ট ব্রিটের সঙ্গে। তিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একজন সহকারী সম্পাদক। পরিচয় হতেই বললেন, আমাদের সম্পাদক ভিলবুর ই গ্যারেট এখন ওয়াশিংটনের বাইরে। তাই তাঁর হয়ে আপনাকে এখানকার কাজকর্ম দেখানর দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চান্ন হবে। প্রচণ্ড চট্‌পটে।

কেণ্ট বললেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সেই 1890 থেকে এ পর্যন্ত 3100টি অভিযানে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণার ব্যাপারেও। তার উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের পৃথিবী, সাগর এবং আকাশ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞাতা বিতরণ করছি।

এক একটি লেখার পেছনে যে কত উদ্যোগ, ভাবা যায় না। ওঁদের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে। তাতে রয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী। তাঁরাই স্থির করেন লেখার বিষয়বস্তু। বিষয়-বস্তু নির্বাচনের পরের কাজ লেখক ঠিক করা। কোন ক্ষেত্রে একজন লেখক, কখনো বা একাধিক। ঠিক হল, অ্যামজন নদীর পরিবেশ অথবা সুমেরুর নেকড়ে নিয়ে লিখতে হবে। এর জন্যে লেখকরা বিভিন্ন পাঠাগারে গিয়ে তা নিয়ে প্রথমে পড়াশুনা করেন। তারপর তাঁরা চলে যান খোদ অ্যামাজন এলাকায় অথবা কুমেরু অঞ্চলের নেকড়ের আড্ডায়। সবই দুর্লঙ্ঘ্য অঞ্চল। কখনো যেতে হয় বিমানে, কখনো স্টিমার অথবা নৌকায়। কুমেরু অঞ্চলে স্লেজে চড়ে ঘুরতে হয় মাইলের পর মাইল—নেকড়ের সন্ধানে। দেখতে হয় কী ভাবে তারা বাস করে, দেখতে হয় তাদের আচরণ। দরকার হলে তাদের উপর কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় চালাতে হয়। সঙ্গে থাকে ক্যামেরাম্যান। দামী ক্যামেরায় ছবি তোলেন তাঁরা। মানে লেখা তো নয়, একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ আর কি। খরচ? কোন অসুবিধে নেই। যানবাহন ক্যামেরাম্যান, হোটেলের খরচ সব ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির। এ ছাড়া লেখকের সম্মানী তো আছেই। সেও মোটা টাকা। হাজার ডলারের ব্যাপার।

কেণ্টের মুখে আরো অনেক কথাই শুনলাম। বললেন, আমরা প্রধানত দুটি দিকের উপর লক্ষ্য রাখি। যেমন ধরুন, সমুদ্র এবং ভূপ্রকৃতি। আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সাগর মহাসাগর সম্পর্কে কত রহস্যই না আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর। স্থলভাগের প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপরও গবেষণা করেছেন।

এর ফলে প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। যাঁরা এ সব কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। কখনো কখনো আমাদের নিজেদের খরচে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করি। এতে করে অনেক নতুন তথ্য যোগাড় করা যায়। লেখার বিষয়বস্তুর কাঠামো তৈরি করতে তাদের কাজে লাগে। আগ্নেয়গিরি, পাহাড় পর্বত, মানুষের মহাকাশ অভিযান, সুমেরু এবং কুমেরু বিষয়ক গবেষণা, অথবা কোন নতুন নক্ষত্র, কিংবা মহাজাগতিক ঘটনা—সব কিছুই আমরা আলোচনার মাধ্যমে আগে থেকে ঠিক করে নিই। তারপর চলে লেখার বিষয় নির্বাচনের সময় আরো একটি দিকের উপরও নজর রাখি আমরা। এমন ভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় যাতে করে সবার পড়ে ভালো লাগে, সবাই বুঝতে পারেন। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র অথবা বিশেষ কোন বিষয়ের মানুষ পড়ুন সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না। এ ছাড়া বিষয়-বস্তুটিও এমন হবে যাতে করে তা পৃথিবীর সব অঞ্চলের লোকের সমাদর পায়। শুধুমাত্র একটি দেশের মানুষ পড়ুক, আমরা তা চাই না।

শুধু পত্রিকাই নয়, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রামাণ্য বইপত্রও প্রকাশ করে এই প্রতিষ্ঠান। সেগুলিরও চাহিদা বিস্তর।

দেখলাম বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দেশ বিদেশের মানুষ, নক্ষত্র জগৎ, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, এমন অনেক বিষয় জনপ্রিয় করে তোলারও জন্যে তাঁদের দপ্তরে সুন্দর একটি মিউজিয়ামও তৈরি করেছেন তাঁরা। প্রচুর ভিডিও টেপ, বিরাট হলে সার সার টেলিভিসন সেট সাজান, তাদের পাশেই তালিকা। তালিকা দেখে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাও, তার একটি নম্বর আছে—সেই নম্বরে বোতাম টেপ। সেই সঙ্গে কানে চড়াও ইয়ার ফোন। অমনি পর্দার উপর ছবি ফুটে উঠবে। কানে শুনব সরল ইংরেজিতে তার বর্ণনা। আধঘণ্টার ছবি, তাতেই কত কিছু যে জানা যায়, কি বলবো। তা ছাড়া ছবির মাধ্যমে দেখানর ব্যবস্থা রয়েছে নানা রকম ঘটনা। তাঁরা বিভিন্ন দেশের মানচিত্রও ছাপান। খুব নির্ভরযোগ্য মানচিত্র।

সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞান বিতরণে এমন ব্যাপক ব্যবস্থা যার কোন তুলনা নেই। এর ফলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি পৃথিবীর সব দেশের শ্রদ্ধা পেয়েছে।

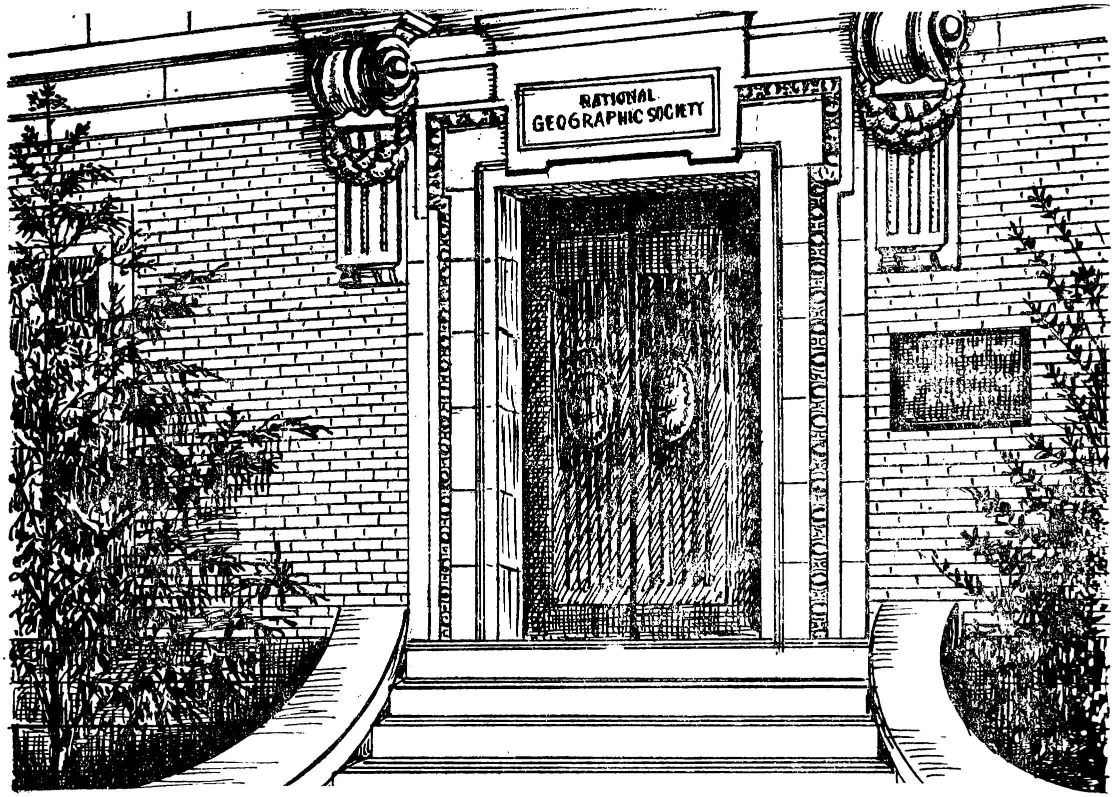

এই সেই প্রতিষ্ঠান—যেখান থেকে পৃথিবীখ্যাত পত্রিকা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' প্রকাশিত হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের 'এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৮৩৯।৮৮

জানা-অজানা

মরুভূমির সঙ্গীত

মরুভূমির নির্জন দিগন্তবিস্তৃত বালি। প্রান্তরের বুকে মাঝে-মাঝে বিচিত্র শব্দের উৎপত্তি হয়। তা অনেকেটা যন্ত্র-সঙ্গীতের আওয়াজের মত শোনায়। অনেকে এই সমস্ত ধ্বনিকে 'Songs of Sand' বলে অভিহিত করেন। যেমন বৃষ্টির (যদিও বিরল ঘটনা) পর বালুরাশি যখন দ্রুত জল শোষণ করে, তখন একযোগে 'হুইশেল' বা শিষ দেওয়ার মত আওয়াজ ওঠে। আবার কখনও কখনও বিশাল বালি-যাড়ির ঢালে ধস নামে। তখন এক ধরনের 'বুম' 'বুম' আওয়াজের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের শব্দ 'Boming Sound' নামে পরিচিত। সাহারা মরুভূমিতে স্থানীয় অনেকেই এই ধরনের আওয়াজের সঙ্গে পরিচিত। যদি কোন আগন্তুক সেখানে গিয়ে প্রথম এই অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনে, তবে সে প্রচণ্ড ভীত হয়ে উঠবে।

জয়দেব ঘোষ

বিশ্বের প্রথম সবাক চিত্র

ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানী লীয়ম্ স্কট দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর 1877 খ্রীস্টাব্দে ফনোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে একখণ্ড কাগজের উপর শব্দতরঙ্গ গ্রথিত করেন। কিন্তু প্রদর্শনের অভাবে তিনি যন্ত্রটি চালাতে পারেন নি। আবার ওই খ্রীস্টাব্দে টমাস আল্ভা এডিসন একটি টিনের উপর শব্দতরঙ্গ গ্রথিত করেন, এবং প্রদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে তা থেকে শব্দ বের করেন। এডিসন এই যন্ত্রের নাম দেন ফনোগ্রাফ। এডিসনের এই আবিষ্কারকে শব্দ পরীক্ষার যুগ বলা হয়। এডিসনের সেই টিনের চোঙা গলাকে বর্তমান কালে আমরা আধুনিক 'রেকর্ড রূপে' দেখতে পাই।

সবাক চিত্র তোলার চেষ্টা করা হয় 1920 খ্রীস্টাব্দে। 1926 খ্রীস্টাব্দের 6 আগস্ট সবাক চিত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন বলা হয়ে থাকে, ঐ দিন রাত্রে আমেরিকার ওয়ার্নার ভ্রাতৃগণ "ডন জুয়ান" নামক একটি সবাক চিত্র আমেরিকার দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করেন। ভিটাফোন নামক এক ধরনের যন্ত্র অনুসরণ করে উইলিয়াম ফক্স মুভিটোনের জন্ম দেন। ফক্সের এই মুভিটোনের জন্মের ফলে ফ্লিমের উপর রেকর্ড করা সম্ভব হয়। এর পরেই সারা বিশ্বে আস্তে আস্তে সবাক চিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে। এখন আমরা যাকে আধুনিক কথায় সিনেমা বলে থাকি।

সৌরভ দে

যান্ত্রিক অনুবাদ

ক্যালকুলেটরের পর এবার এল—'ভয়েস'। এটি একটি ছোট কম্পিউটার। এতে যে কোন ইংরাজী বাক্যকে 4টি ভাষায় অনুবাদ করা যায়। ভাষাগুলি হল—ইতালীয়, জার্মান, ফরাসী ও স্পেনীয়। ভয়েস নামের এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার পদ্ধতি বড় সহজ। অনুবাদের জন্য ভয়েস যন্ত্রের কাছে মুখ এনে ধীরে ধীরে ইংরাজী বাক্যগুলো বলতে হবে। প্রত্যেকটা ভাষার জন্য আলাদা আলাদা 4টি কার্টিজ আছে। এই কার্টিজে চারটি ভাষার নামও লেখা আছে। ভয়েস যন্ত্রে কার্টিজ বসিয়ে বোতাম টিপলে কার্টিজের উপর যে ভাষার নাম লেখা থাকবে সেই ভাষার অনুবাদ পর্দায় ভেসে উঠবে। এখনও পর্যন্ত এই 4টি ভাষা ছাড়া আর অন্য কোন ভাষার অনুবাদ করা সম্ভবপর হয়নি।

ভিটামিন

লণ্ডনের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শিশুদের অতিরিক্ত ভিটামিন খাওয়ানো মানে তাদের মুখে বিষ তুলে দেওয়া। তাদের মতে ভিটামিন B, C, এবং D বেশি খাওয়ালে কিডনী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। স্নায়ু হাত বা পা অবশ হয়ে যেতে পারে, এমনকি বুমেরাং রোগও হতে পারে। শরীরের প্রয়োজনে ভিটামিন খাওয়া অবশ্যই দরকার, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরাই একমত যে প্রকৃতি থেকে বাঁচার যে উপাদান সংগ্রহ করা যায় সেটাই সবচেয়ে ভাল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যত ভাল খাদ্যই তৈরী হোক না কেন প্রকৃতির উপাদান থেকে তৈরী খাবারের মত পুষ্টিকর খাবার কখনই হবে না। ট্যাবলেট শক্তি জোগায় ঠিক, কিন্তু নিয়মিত খেতে থাকলে দেহের পাকযন্ত্রে খাদ্য থেকে ভিটামিন সংগ্রহ করার ক্ষমতাকে অনেকখানি দুর্বল করে দেয়। শুধু ভিটামিন নয়, যে কোন ওষুধের উপর স্বাস্থ্যের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করা ক্ষতিকর।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে শেষ কথা কিছু নেই। প্রতিদিন গবেষণা চলছে, হচ্ছে নানান পরিবর্তন। একসময় আমাদের দেশে এ্যাসপিরিন ছিল অব্যর্থ ওষুধ ; কিন্তু গবেষণায় দেখা গেল এ্যাসপিরিন আবার দেহের ক্ষতিও করে! সুতরাং মানুষের কাছে এই অব্যর্থ ওষুধ এ্যাসপিরিনের দাম কমে গেল। তারপর আরও গবেষণার পর প্রমাণ হল যে, হৃদরোগীদের জন্য ভরা পেটে রোজ একটা এ্যাসপিরিন খাওয়া খুব উপকারী। এই এ্যাসপিরিন হৃদরোগীরা ব্যবহার করার ফলে তাদের হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা 50% কমে যায়। অর্থাৎ কোন ওষুধকে দীর্ঘদিন ধরে ভাল অথবা খারাপ বলা বড় মুশকিল।

জয়ন্ত মণ্ডল

ঘরের জানলা খুলেই দেখা যাবে আলাস্কার বরফ-ভূমি, শাদা ভাল্লুকের দল এগোচ্ছে তুষার ভেঙে ভেঙে। সিল মাছেরা আড্ডা বসিয়েছে। কালো-শাদার পেঙ্গুইনরা রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে—এদিক-সেদিক। তারপরই হয়ত চোখে পড়বে আফ্রিকার গভীর অরণ্য ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন কোনো অভিযাত্রী, উদ্দেশ্য—লুপ্তপ্রায় আদিম উপজাতির শেষ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করা। সাভানা-র ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে জিরাফ-জেব্রা-ক্ষুধার্ত সিংহ-সিংহী। হরিণের পাল লক্ষ করে ঝাঁপ দিয়েছে চিতা। লাতিন আমেরিকার ঈগল নজর রাখছে শিকারের ওপর।

নাহ, এসবই কোনো সিনেমা দৃশ্যের বিষয় নয়। একশো বছর ধরে একটি পত্রিকা এমনই সব বিচিত্র অভিযান, জীব-জন্তু-পাখি, নদী-অরণ্য-মরুভূমি—এমন কি আধুনিক নগর জীবনের কথাও পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের কাছে। পত্রিকাটির নাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। 1988তে পূর্ণ হলো এর একশো বছর। সেই কথা মনে রেখেই এ লেখা।

আর শুধু অজানা পৃথিবীর কথাই তো নয়, আমাদের চেনা বারাণসীর ঘাটগুলি রঙে রিপোর্টে যখন হাজির হয় 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর পাতায় পাতায় বা ভারতীয় উপমহাদেশের এক দীর্ঘ রেলযাত্রা যখন হয় এর মলাট-কাহিনী, তখন আমরা বিস্মিত এবং সমৃদ্ধ হই, বর্ণনায়, বিবরণে, ছাপা ছবিতে।

যাঁরা অভিযান ভালোবাসেন, অ্যাডভেঞ্চার, প্রাণীতত্ত্ব নৃতত্ত্ব, ভূগোল বা প্রাচীন ইতিহাস যাঁদের আকর্ষণ করে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রতিটি পাতাই তাঁদের কাছে সমান মূল্যবান, ভাবনা-চিন্তার বিষয়।

আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে ছেপে আসা এ কাগজটি আমাদের দেশে আসতে একটু সময় নেয়। প্রায় দুমাস দেরিতে পাওয়া যায় কাগজ। তবুও পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মন যায় ভরে। কি লেখা, কি ছাপা, কি ছবি, কি রঙের বাহার!

বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে এই যে লেখালেখির চেষ্টা, তা আমাদের দেশে তো নেই, বিদেশেও আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্যাংচুয়ারি পত্রিকাটির নাম এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়ত করবেন। ত্রৈমাসিক এই কাগজে ছাপা, ছবি ও লেখা নিঃসন্দেহে অনবদ্য। তবে স্যাংচুয়ারির বিষয় সীমাবদ্ধ। মূলত প্রাণী জীবনই এর লেখাগুলিতে ফুটে উঠতে দেখি বারে বারে। আর এই যে সব জীবজন্তুর বিবরণ, তারা সকলেই ভারতীয়। অন্য কোনো তথ্য সেখানে তেমন গুরুত্ব পেতে দেখিনি। আর একটি পত্রিকার কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। নাম 'জিও' (Geo)। কাগজটি নতুন অবস্থায় কখনও দেখিনি। কলকাতার ফুটপাতে পুরানো বইয়ের দোকানে, বিশেষ করে

জ্যোতি সিনেমা ছাড়ালে ওয়েলিংটনের মুখে ফুটপাতের ওপর যে পুরনো ছাপা হরফের হাট, সেখানে জিও চোখে পড়ত। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের থেকে চেহারায় অনেক বড়সড়, চৌকো এই পত্রিকার ছাপা ছবি এবং লেখার বিষয় 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। সে সব কথা থাক, এখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা কেমন করে তৈরি হলো—সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

1888 সালের 13 জানুয়ারি 33জন মানুষ 'কসমস' ক্লাবে একদিন বসে ঠিক করলেন এমন একটা সংগঠন তৈরি করা দরকার, যার ভেতর দিয়ে বাড়ানো যাবে ভূগোলের জ্ঞান। চারপাশের এই যে পৃথিবী, চেনা-জানা, তার থেকেও অনেকটা দূরের যে রহস্যময় না-জানা ভুবন, তার খবর জানা দরকার একটু একটু করে। সুতরাং বেরিয়ে পড়। বেরিয়ে পড়।

ভাবনাটি একটু একটু করে রূপ দিতে থাকে। এর কিছুদিন পরই তাঁরা ঠিক করলেন একটি পত্রিকা বের করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে ভূগোলের জ্ঞান বাড়ানোর নানা উপাদান, অভিযানের বিবরণ, অরণ্য, ভূ-তত্ত্ব, আর জীবজন্তু পাখি নিয়ে নানা অজানা কথা। 1888-র অক্টোবরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। রোগা চেহারার সেই কাগজই এখন হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে। শুধু মাটির ওপরেই নয়, সমুদ্রের নিচেও এখন হাজির 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর ক্যামেরা। বহুদিন আগে ডুবে যাওয়া জাহাজের পেটের ভেতর থেকে কি কি পাওয়া গেল, তাও যেমন ছবি হিসেবে বেরোয়, তেমনি বেরোয় সাগর তলের প্রাণীদের নিয়ে সচিত্র রচনা।

প্রথম যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বেরোয় তখন তার সদস্য সংখ্যা ছিল মেরে কেটে দুশো জন। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটিরও ওপরে।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন Gardiner Greene Hubbard. তিনি তাঁর ভাষণে একবার 'সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, the seatter workers [in geography, Science and exploration of our country with the persons who desire to promote their researches'.

Hubbard কিন্তু বিজ্ঞানী ছিলেন না। তাঁর পেশা ছিল আইন-ব্যবসা। Hubbard এর জামাই ছিলেন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল। Hubbard আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোন কোম্পানীটি তৈরির ব্যাপারে নানারকম সহযোগিতা করেছিলেন। 1897-এ তিনি মারা গেলে তাঁর জামাই হয়েছিলের সোসাইটির সভাপতি।

1888 র 13 জানুয়ারি কসমস ক্লাবের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অভিযাত্রী, প্রকৃতিবিদ, ভৌগোলিক, প্রাণীতত্ত্ববিদ, সামরিক বাহিনীর অফিসার, শিক্ষাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এঞ্জিনিয়ার—এমনই নানা ধরনের মানুষ।

সভায় Gardiner Greene Hubbard-কে ছাড়া দেখা গেছিল ব্রিগেডিয়ার আডলফাস, ওয়াশিংটন গ্রিলি, ভূতত্ত্ববিদ এবং অভিযাত্রী জন ওয়েসলি, পাওয়েল, জর্জ কোনান, হেনরি গ্যানেট, ও এইচ টিটমাস, এইচ ডাল, রবার্ট মালড্রো (সেকেণ্ড) আর ছিলেন এডওয়ার্ড ই হেডেন।

ব্রিগেডিয়ার অ্যাডলফাস ওয়াশিংটন গ্রিলি ছিলেন আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর প্রধান সিগন্যালার। ও'র আর্কটিক অভিযানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা তখন সকলের মুখে মুখে। জন ওয়েসাল পাওয়েল এ্যাণ্ড ক্যানিয়ালের ভেতর দিয়ে কলরাডো নদীতে অভিযান করেছিলেন। নৌকো চেপে সেই নশো মাইল যাত্রা—যা ভাবলেও ঘনিয়ে আসে ভয়। সেই অভিযানের কথা পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে। এমন রোমাঞ্চকর সেই যাত্রা। জর্জ কোনান এগারো সপ্তাহ ধরে সাইবেরিয়া অভিযান সেরে ফিরে এসে লিখেছিলেন 'সেন্ট লাইফ ইন সাইবেরিয়া।' হেনরি গ্যানেট তৈরি করেছিলেন কলরাডোর ম্যাপ। এইচ. ডাল-এর আলাস্কা অভিযানের কাহিনী তখন অনেকেই জেনে গেছেন। ভূতত্ত্ববিদ মালড্রো (সেকেণ্ড) Mount Mckinley-র মাপজোক করেছিলেন। আর এডওয়ার্ড ই হেডেন তাঁর একটি পা খুইয়েছিলেন ভূমিকম্পের দাপটে।

এই অনুষ্ঠানের জন্যে যে আমন্ত্রণলিপিটি ছাপা হয়েছিল, তার বাংলা অনুবাদ করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়াবে।

ওয়াশিংটন ডি. সি 10 জানুয়ারি 1888

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে 13 জানুয়ারি রাত আটটার সময় কসমস ক্লাবের একটি সভায় আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই সভায় আমরা আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে একটি সংস্থা গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

ইতি বিনীত, আপনাদের
হেনরি মিচেল

গার্ডিনার জি হুবার্ড	ইউ এস কোস্ট অ্যাণ্ড জিওলজিকাল সার্ভে
এ ডব্লিউ গ্রিলি	চিফ সিগন্যাল অফিসার, ইউ. এস. এ
হেনরি জেনেট	ইউ এস জিওলজিকাল সার্ভে
জে আর কর্টলেট	কমাণ্ডার ইউ এস এন
এ এইচ থম্পসন	ইউ এস জিওলজিকাল সার্ভে

এবং অন্যান্যরা।

Hubbard এই সংস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—'By my election',—তিনি আরও বিশদে গিয়ে বললেন, you notify the public that...ou. society will not be confirmed to professonal Geographers'...অর্থাৎ তার মূল কাজটি হবে দেশের সাধারণ মানুষকে অভিযান সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলা। বাড়াতে হবে তাদের ভূগোলের জ্ঞান। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে গোটা জাতিকে।

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা। মনে রাখতে হবে এই কাগজ যখন তৈরি হয়েছে, তখন এবং তার কয়েক বছর আগে পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষ দেখেছে নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের নেশায়। জীবন তুচ্ছ করে একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করছেন বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রীরা। বহু সময়, অর্থ, পরিশ্রম এমন কি অমূল্য প্রাণও চলে যাচ্ছে—এই সব অভিযানে। এডুইন পিয়ারি, স্কট, অমুণ্ডসেন, আর আরও নানান অভিযাত্রী তাঁদের জীবন বাজি রেখে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সুন্দর-দুর্গমের সন্ধানে। চলতে চলতে সফল হয়েছেন কেউ। সম্মান আর প্রচারের খ্যাতিতে উঠে এসেছেন সবায়ের শীর্ষবিন্দুতে। আর কেউ বা শুধুই ডুবেছেন ব্যর্থতায়। এমন কি খোয়াতেও হয়েছে মূল্যবান প্রাণও।

ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা এগিয়ে এসেছিলেন এই সংগঠনকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্যে। সোসাইটি যাতে বাঁচে – বেড়ে ওঠে—সেই দিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। তাঁদের আর্থিক সহায়তায়, দানে ক্রমেই বনিয়াদ শক্ত হয়েছে সোসাইটির। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় উন্মোচিত হয়েছে গবেষণা অভিযানের নতুন নতুন দিগন্ত।

1888-তে Hubbard তাঁর মূল ভাষণটি শুরু করেছিলেন এভাবে—'I am not a scientific man, nor can I claim to any special knowledge that would entitle me to be called a "Geographer." I owe the honuor of my election as president of the National Geographic society simply to the fact that I am one of those who desire to further geographic research. I possess only the same general interest in geography that should be felt by every educated man.'

Hubbard-এর ভাষণের এটুকু পড়লেই বোঝা যাবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এগিয়েছিলেন।

1888-র 13 জানুয়ারি কসমস ক্লাবে যে 33 জন মানুষ সংগঠন তৈরির জন্যে একটি সভা করেছিলেন। তার স্মৃতিটুকু মনে রেখে একটি ছবি টাঙানো আছে এখানে—এই শতবর্ষের স্মৃতিকে মনে রেখে।

1988-র জানুয়ারি মাসের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকটি প্রকাশিত হয়েছে এই শতবর্ষের স্মৃতি ও ইতিহাসকে স্মরণ করে। এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অভিযান কাহিনীর একটি সংকলন। পুরনো দিনের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক থেকে কয়েকটি রিপোর্টিংয়ের নমুনা এখানে তুলে দেয়া হলো।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর প্রথম বছরের চতুর্থ সংখ্যায় তরুণ নৌ-সিভিল ইঞ্জিনিয়ার R. E. Peary-র লেখা 'Across Nicaragua with Trannit and Machete' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কষ্ট, শ্রম ও রোমাঞ্চ মিশ্রিত যাত্রার এক বিবরণের আংশিক বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হলো পুরনো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর পাতা থেকে।

'দিনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাত নেমে এলে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসি। তখন দেখতে পাই টেবিল আলো করে সাজানো রয়েছে রান্না করা হরিণ, টার্কি অথবা বুনো শুয়োরের মাংস। কখনও কখনও সব ধরণের মাংসই থাকে এক সঙ্গে।

'খাওয়ার পর ধূমপান। তারপরই সারা দিনের কাজের হিসেব। নোটগুলো লিখে গুছিয়ে রাখি। কাজ শেষ হলেই শুনতে পাই বনভূমি থেকে উঠে আসা নানা ধরনের শব্দ। অগুনতি এই শব্দমালার ভেতর মিশে থাকে কখনও বাঘের গর্জন, কখনও বা পুমার হুংকার। এই সব শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুম আসে। আর যতক্ষণ না ষাঁড়ের মতো হেঁড়ে গলায় বাঁদররা নতুন ভোরের খবর দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুম থাকেই।'

জাপানি ঝঞ্চা বাত্যা তসুনামির একটি বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর পাতায়। তার নির্বাচিত অংশের বাংলা অনুবাদ এখানে দেয়া হলো। 1896 এ প্রকাশিত হয়েছিল এই বিবরণ।

15 জুনের ব্যারোমিটার কোনোরকম প্রাকৃতিক গোলমালের সংকেত দেয়নি। সকালে আর বিকেলে বৃষ্টি পড়েছিল। 80 থেকে 90 ডিগ্রি তাপমাত্রার আবহাওয়া ছিল খুবই অস্বস্তিকর। দূরে তীরভূমির গ্রামবাসীরা তাদের পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী স্থানীয় উৎসব আর ছুটি পালন করছিলেন। বৃষ্টি তাঁদের তাড়া করে ঢুকিয়ে দিল ঘরের ভেতর। তখন রাত আটটা হবে। ঘন অন্ধকার। গর্জন আর গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দ। হঠাৎ ছুটে আসা জলের তোড়ে তাঁরা ভেসে গেলেন। যে ক'জন মাত্র বেঁচেছিলেন, তাঁরা ছুটে আসা ঢেউকে দেখেছিলেন 600 গজ দূর থেকে আসা শাদা বালির দিকে দৌড়ে আসতে। 80 ফুট উঁচু কালো দেয়ালের কতো সেই ঢেউয়ের মাথায় ছিল ফসফরাসের মুকুট। অন্যরা শুনতে পেয়েছিলেন ভয়াবহ কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ—তসুনামি! তসুনামি!

'যাঁরা দোতলায় উঠে নিজেদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ডুবে গেছেন, আটকে পড়েছেন। নয়তো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছেন এই প্রলয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের দাপটে। সামান্য কয়েকজন মাত্র ছাদ ভেঙে বেরিয়ে এসে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তসুনামি কাছি দিয়ে বেঁধে রাখা জাহাজকে দু মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝড়ে-ঢেউয়ে আছাড় খেয়ে কেউ কেউ হাজির হয়েছেন গাছের মাথায়, কেউ বা পাহাড় চুড়োয়। আর ঘর-বাড়ির ধ্বংস-স্তূপের তেতর কেউ কেউ। অনেক জীবিত মানুষকে ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দূরে। খোলা তীরভূমি থেকে এই জল ও ঢেউ সরে যায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু অনেকটা ভেতরে এসে তা আটকে ছিল বহু সময় ধরে। সেরা সাঁতারুরাও অনেকেই ছিলেন অসহায়। গাছ বা পাথরে ধাক্কা খাওয়া বহু বিকৃত মৃতদেহ চোখে পড়েছে।

'দীর্ঘ পাইনের সারি ছেঁটে দিয়েছে এই ঢেউ। গ্রানাইট পাথরে তৈরি মন্দিরের গেট এবং বিম উপড়ে তুলে আছড়ে ফেলেছে 300 গজ দূরে। বহু মানুষ মারা গেছেন, হয় অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে, নয়তো নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে।

'একজন রাজভক্ত স্কুল শিক্ষক সম্রাটের ছবি নিরাপদ জায়গায় রাখেন, তাঁর পরিবারের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে। গত যুদ্ধের পর অবসর নেয়া এক সৈনিক এই ভয়ংকর শব্দ শুনে ভেবেছিলেন বোধহয় শত্রুবাহিনী আক্রমণ করেছে। তিনি খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে গিয়েছিলেন। তারপর যা হওয়ার হয়েছিল।'

এমনই অসংখ্য রিপোর্ট, স্মৃতি, বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রতিটি পাতা —গত একশো বছর ধরে। তার জন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ আদায় করে নিতে পারবেন সংগঠকেরা। বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় দুনিয়ার পাঠকদের কাছে। যাঁরা অনেকেই এ ধরনের ছবি ও রিপোর্টিং দেখতে অভ্যস্ত নন।

আবার ভূগোল ও বিজ্ঞানের বাইরে প্রকাশিত কিছু কিছু তথ্য নিয়ে অনেকের মনে সংশয়ও উপস্থিত হয়।

কম্পিউটারে কিভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়

কম্পিউটারের ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনিক মেমরি। এই মেমরিতে প্রতিটি ডিজিটাল তথ্যের বিট্ আলাদা আলাদা কোপে সংরক্ষণ করা হয়, যাকে কম্পিউটার পরিভাষায় বলে এক একটি মেমরি সেল (Memory Cell) কম্পিউটারের ডিজাইন অনুসারে চারটি, আটটি বা ষোলটি মেমরি সেলকে একত্রিত করে তৈরী করা হয় একটি মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেশ (Memory location address). পোস্ট অফিসের পোস্ট বক্সের সঙ্গে মেমরি লোকেশনের তুলনা করা চলে। একটি পোস্ট অফিসে যেমন অনেকগুলি পোস্ট বক্স থাকে, তেমনি একটি ইলেকট্রনিক মেমরিতে থাকে হাজার হাজার মেমরি লোকেশন। তাছাড়া প্রতিটি পোস্ট বক্সের যেমন থাকে আলাদা পোস্ট বক্স নাম্বার, ঠিক তেমনি প্রতিটি মেমরি লোকেশনেরও থাকে আলাদা মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেশ। কম্পিউটারের কোনো তথ্য সংরক্ষণ করার দরকার হলে CPU ইলেকট্রনিক মেমরির হাজার হাজার মেমরি লোকেশনের মধ্যে থেকে কোনো একটি বিশেষ মেমরি লোকেশন বেছে নিয়ে তাতে ডিজিটাল তথ্য লিখে রাখে। পরে সেই তথ্য পড়ে দেখার দরকার পড়লে CPU ওই একই মেমরি লোকেশন থেকে তথ্য পড়ে নিতে পারে।

কম্পিউটার মেমরির তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করা হয় কিলো বাইট (Kilo Byte) অথবা সংক্ষেপে K এককে। আমরা আগেই জেনেছি এক বাইট সমান আট বিট তথ্য। সেই হিসেবে এক K বাইট সমান 1000 বিট তথ্য ধরলে কিন্তু ভুল হবে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে এক কিলো বাইট বলতে বোঝায় $2^{10} = 1024$ বিট্ তথ্য।

যে ইলেকট্রনিক মেমরিতে যত বেশি K বাইট তথ্য ধরে সংরক্ষণ ক্ষমতা তত বেশি ধরা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কমোডোর বা স্পেক্ট্রাম হোম কম্পিউটারে 64 K ইলেকট্রনিক স্মৃতি থাকে। আর তাদের থেকে আরো শক্তিশালী 16 বিট্ PC কম্পিউটার গুলিতে থাকে 640 K মেমরি।

কোনো কোনো কম্পিউটারে আরো বড় মেমরির ব্যবস্থা থাকে। তাদের মেমরি এতো বড় যে তাকে লেখবার জন্য K এককের থেকেও আরো বড় একক ব্যবহার করা হয়। যাকে বলা হয় মেগাবাইট (Mega Byte) অথবা সংক্ষেপে MB. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অনুযায়ী 1024 K Byte = 1 MB. আধুনিক মেইনফ্রেম বা সুপার মিনি কম্পিউটার গুলিতে আরো বড় মেমরি থাকে। এই মেমরির ক্ষমতা প্রকাশ করা হয় গিগা বাইট (giga Byte) বা সংক্ষেপে G byte এককে। এক G byte = 1024 MB তথ্য। কম্পিউটারে কাজ করতে গেলে তাই সব থেকে আগে বিট্, বাইট, কিলো বাইট, মেগা বাইট ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্কটি মনে রাখতে হয়।

দুরকম ইলেকট্রনিক মেমরি
র‍্যাম আর রম

কম্পিউটারে দুরকম ইলেকট্রনিক মেমরি ব্যবহার করা হয় র‍্যাম (RAM) আর রম (Rom). RA Mএর পুরো কথাটি হলো Random Access Memory আর Rom এর পুরো কথাটি হলো Read Only Memory.

RAM এর সঙ্গে ব্ল্যাক বোর্ডের তুলনা করা চলে। ব্ল্যাক বোর্ডে আমরা যেমন যা খুশি লিখতে পারি, আবার দরকারে ডাস্টার দিয়ে সব লেখা মুছে সাফ করে দিয়ে নতুন কিছু লিখতে পারি ঠিক তেমনি কম্পিউটারের CPU একটি RAM এ যে কোনো মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেশ করে তাতে ডিজিটাল তথ্য লিখতে পারে বা পড়তে পারে। কম্পিউটার পরিভাষায় মেমরিতে কিন্তু লেখাকে বলা হয় Memory write Operation এবং আগে লিখে রাখা তথ্য পড়াকে বলা হয় Memory Read Operation. তবে RAM এর একটাই অসুবিধা, যতক্ষণ এর বিদ্যুৎ যোগান অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ RAM এ লিখে রাখা তথ্য অবিকৃত থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি RAM এর বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা পড়ে (এক মুহূর্ত বলতে পাঁচ থেকে দশ ন্যানো সেকেণ্ডের মত সময় বোঝাতে চেয়েছি) বা যখন লোডসেডিং হয়ে যায়,

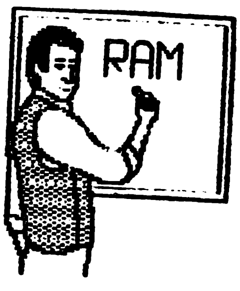

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে RAM এ লিখে রাখা যাবতীয় তথ্য মুছে যায়।

এই কারণেই কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই সরাসরি ঘরের প্লাগ পয়েন্ট থেকে নেওয়া যায় না। এর জন্য অনেক রকম জটিল স্টেবিলাইজার যেমন সিভিটি (CVT), সার্ভো স্টেবিলাইজার এবং বিশেষ ধরণের ইনভার্টার যার নাম ইউ পি এস (UPS). ব্যবহার করা হয়। এই সব যন্ত্র কম্পিউটারের সাপ্লাই ভোল্টেজকে পাক্কা দুশো কুড়ি ভোল্টে বেঁধে রাখে, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজ ওঠা পড়াতেও আউটপুট ভোল্টেজ পরিবর্তিত হয় না। আর ইউ পি এস যন্ত্রটি হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বারো বা কুড়ি ভোল্টের ব্যাটারি থেকে দুশো কুড়ি ভোল্ট বিদ্যুৎ তৈরী করে কম্পিউটারকে যোগান দিতে শুরু করে, ফলে কম্পিউটারের বিদ্যুৎ প্রবাহে কোনো ছেদ পড়ে না।

ROM এর কাজ কিন্তু একটু অন্য রকম। ROM এর সঙ্গে আমাদের নোট বই এর তুলনা করা চলে। দোকানে নতুন সাদা পাতার নোট বই-এর মতো ফাঁকা (Blank) ROM কিনতে পাওয়া যায়। আমরা যে রকম কলমের সাহায্যে নোট বইয়ের সাদা পাতায় নোট লিখি, ঠিক তেমনি একটি ফাঁকা ROM এ বিশেষ PROM Programmer যন্ত্রের সাহায্যে ডিজিটাল তথ্য লিখে রাখা যায়। তবে ROM এ একবার কোনো তথ্য লেখা হলে সেটি আর মোছা যায় না, যেমন নোট বই-এর পাতা থেকে কালিতে লেখা নোটকে মুছে ফেলা যায় না। এখানেই RAM-এর সঙ্গে ROM এর প্রধান তফাৎ। PROM Programmer যন্ত্রের সাহায্যে ROMকে প্রোগ্রাম করার পর বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ করে দিলেও ROM এর তথ্য অবিকৃত থাকে।

ইপ্রম, ইস্কোয়্যার রম আর বাব্‌ল মেমরি

ROM আর RAM ইলেকট্রনিক মেমরির মধ্যেও অনেক রকম বিভাগ আছে। যেমন EPROM আর E^2ROM (ইপ্রম, ইস্কোয়ার রম) নামে দুটি বিশেষ ধরণের ROM আছে, তাদের তথ্য আবার ইচ্ছে করলে মুছে ফেলা যায়। EPROM-এর তথ্য মোছা হয় জোরালো আল্ট্রা ভায়োলেট আলোর সাহায্যে। এই কাজের জন্য EPROM আই সি গুলির ওপর ছোট্ট কোয়ার্জের (Quartz) স্বচ্ছ জানালা থাকে। ওই জানলা দিয়ে ভিতরের সিলিকন চিপের ওপর তৈরি EPROM আইসিটা দেখা যায়। তথ্য মোছার সময় আল্টা ভায়োলেট ল্যাম্পের তলায় EPROM আই সিকে আধ ঘণ্টা রেখে দিতে হয়। এই সময় ওই জানলা দিয়ে আল্টা ভায়োলেট আলো ভেতরের সার্কিটের ওপর পড়ে আর ফোটো ইলেক্‌ট্রিক এফেক্টের সাহায্যে

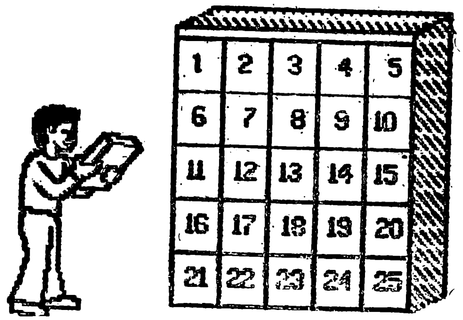

EPROM সার্কিটে বৈদ্যুতিক চার্জের সাহায্যে সংরক্ষিত তথ্যকে ডিসচার্জ করে মুছে দেয়। সুতরাং সাধারণ ROM এর থেকে EPROM ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি। তবে EPROM-এ সংরক্ষিত তথ্য মোটামুটি বছর দশেকের জন্য স্থায়ী হয়। এর পর EPROM-এর ভেতরের চার্জ গুলি ডিসচার্জ হয়ে তথ্যকে ওলোট-পালোট করে দিতে পারে। তাই আরো বেশি সময়ের জন্য যদি কোনো তথ্যকে সংরক্ষণ করতে হয় তখন সাধারণ ROM-ই ব্যবহার করা হয়।

E^2ROM-এর তথ্য মোছার জন্য বিদ্যুৎ স্পন্দন ব্যবহার করা হয়। এই সুবিধার জন্য E^2ROM-এর তথ্য আমরা কম্পিউটারে বসানো অবস্থাতেই মুছে ফেলতে পারি, যেটা EPROM-এর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। EPROM কে মুছতে গেলে তাকে কম্পিউটার থেকে খুলে নিয়ে আল্টা ভায়োলেট আলোর তলায় রাখতে হবে। এ ঝামেলা E^2-এ নেই। তাই অনেক আধুনিক পকেট কম্পিউটারে E^2ROM তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে EPROM-এর মতো E^2ROM এর ব্যবহার অতো জনপ্রিয় নয়।

Bubble Memory হলো একটি অত্যাধুনিক মেমরি যাতে অনেক অনেক হাজার বাইট তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এই মেমরিটির আরো কি ভাবে উন্নতি ঘটানো যায়, এ বিষয়ে এখনো গবেষণা চলছে। বর্তমানে বহু মাইক্রো এবং মিনি কম্পিউটারে বাবল্ মেমরি ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ RAM এর থেকে একটি বাবল্ মেমরি বহুগুণ বেশি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। দুই/তিন মেগাবাইটের বাবল্ মেমরিতো এখনই কিনতে পাওয়া যায়। চেষ্টা চলছে যাতে একটি বাবল্ মেমরিতে আরো অনেক মেগা বাইট তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

দুরকম মেমরির প্রয়োজন কোথায়

'কম্পিউটার চালাতে গেলে RAM, বা ROM এ দুরকম মেমরির প্রয়োজন কোথায়? এ প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসা স্বাভাবিক। উত্তরটি কিন্তু একটু চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমাদের মস্তিষ্কেও কি RAM আর ROM-এর মতো দুরকম স্মৃতি ব্যবস্থা নেই ? নিশ্চয় আছে। আর আছে বলেই তো আমরা নতুন নতুন তথ্য লিখতে পারি। তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস, যেমন নিজের নাম ঠিকানা কিম্বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য চিরকাল মনে থেকে যায়, অথচ বারবার পড়েও পরীক্ষার পড়া মনে থাকতে চায় না। দুদিন চর্চা না করলেই বিলকুল সব RAM ফাঁকা ! আসলে আমাদের নিজেদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর প্রিয় তথ্য গুলিই চিরকালের মত মনের ROM-এ write হয়ে যায়। জোর করেও সে সব তথ্য মুছে ফেলা যায় না। আর যদি কোনো ক্রমে মুছে যায় তবে কি হয় ? ঠিক ধরেছো, মানুষ তখন আর নিজের নাম মনে করতে পারে না, কাউকে চিনতে পারে না এক কথায় স্বাভাবিক মানুষ আর না থেকে পাগল হয়ে যায়।

কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। কম্পিউটারকে ঠিক ভাবে চালাতে গেলে সর্বদা একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ভরে দেওয়ার দরকার পরে। ওই প্রোগ্রামটিকে কম্পিউটার পরিভাষায় Booting Program এবং Monitor Program বলা হয়। এই প্রোগ্রামটির সাহায্য নিয়েই CPU কম্পিউটারকে সুইচ অন্ করার পর সমস্ত যন্ত্রপাতিকে চালু করতে পারে। এক কথায় কম্পিউটারের মস্তিষ্কে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে ওই প্রোগ্রাম। তাই মনিটর প্রোগ্রামকে যদি ROM-এ চিরস্থায়ী করে লিখে রাখা না হয় তবে কম্পিউটার সুইচ্ অন্ করলেও কম্পিউটার চালু হতে পারে না। এ যেন ঠিক অজ্ঞান হয়ে থাকার মতো অবস্থা, হার্ট চলছে ফুসফুস নিশ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু সারা শরীরই অসাড় হয়ে আছে।

অপর পক্ষে কম্পিউটার শুধু চালু হলেই চলবে না, তাকে বাইরে থেকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এই নির্দেশের প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করার জন্য RAM-এর প্রয়োজন। RAM-এ বিভিন্ন প্রোগ্রাম লোড করে আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে নানা রকম কাজ করিয়ে নিতে পারি।

ফার্মওয়্যার এবং সফট্ওয়্যার

কম্পিউটার চালু করার জন্য এবং তাকে নিয়ে নানা রকম ইন্পুট/আউট্পুটের কাজ করানোর প্রোগ্রামটি হলো মনিটর প্রোগ্রাম এবং এটি ROM-এ লেখা থাকে, এ কথা আমরা একটু আগেই জেনেছি। তবে সব কম্পিউটার কোম্পানি একে Monitor Program বলে না। যেমন IBM কোম্পানি তাঁদের কম্পিউটারের মনিটর প্রোগ্রামের নাম দিয়েছেন BIOS (Basic Input Output System) তবে নাম যাই হোক না কেন, এই প্রোগ্রাম গুলি সব সময় কম্পিউটার নির্মাতারাই তাদের কম্পিউটারের ROM-এ

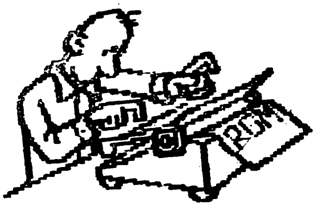

রেকর্ড করে কম্পিউটারে বসিয়ে দেন। কম্পিউটার পরিভাষায় এ ধরণের প্রোগ্রামকে বলা হয় Firmware। তবে একটি ফার্মওয়্যার কম্পিউটারকে দিয়ে কি কি করাতে পারবে সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্মাতা সংস্থার ওপরই নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি সাধারণ হোম কম্পিউটারে ছোট্ট 8K বাইট লম্বা ফার্মওয়্যার কম্পিউটারকে চালু করতে পারে, টিভির স্ক্রিনে ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে কিম্বা কম্পিউটার অপারেটরের BASIC ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম পড়ে কাজ করতে পারে। এক কথায় কম্পিউটারটি চালানোর যাবতীয় প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্মই ফার্মওয়্যারটি করে থাকে। অপর দিকে IBM Compatible PC কম্পিউটারে 64K বাইট লম্বা BIOS প্রোগ্রাম কম্পিউটারের আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতি পরীক্ষা, কম্পিউটার ঘড়ির সময় রক্ষা এবং যাবতীয় সমস্ত রকম ইন্পুট্/আউটপুটের কাজ কর্ম তদারক করে। তবে শুধু মাত্র এই কটি কাজই PC কম্পিউটারকে চালু করার পক্ষেই যথেষ্ট নয়, এর জন্য আরো অনেক নির্দেশ দরকার। প্রোগ্রামের সেই অংশটি ROM-এ ভরা থাকে না। এটি বাইরে থেকে ফ্লপি ডিস্কের সাহায্যে কম্পিউটারের RAM-এ লোড্ করা হয়। তারপর ROM আর RAM-এর প্রোগ্রাম একত্রিত ভাবে কম্পিউটারকে চালু করে। IBM কোম্পানী তাই তাঁদের ডিস্ক থেকে RAM-এ লোড্ করা ফার্মওয়্যারের নাম দিয়েছেন DOS বা Disk Operating System, অন্যান্য বড় ধরনের 16 কম্পিউটার। যেমন, Apple, Commodore Amiga ইত্যাদিতেও এই রকম ROM আর Disk bared Operating System ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটার চালু হওয়ার পর দরকার হয় একটি উপযুক্ত প্রোগ্রাম, যেটি RAM-এ লোড করে CPUকে সেই নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে বললেই কম্পিউটারটি একটি টাইপ রাইটার, হিসেব নিকেশের লেজার খাতা, ছবি আঁকার ইজেল কিম্বা ভিডিও গেম খেলার মেশিনে পরিণত হবে। এই প্রোগ্রাম গুলিকেই বলা হয় সফট্ওয়্যার (Software)। কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিজেই লিখতে পারেন, অথবা দোকান থেকে ডিস্কে বা ক্যাসেটে রেকর্ড করা অবস্থায় কিনে আনতে পারেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই সারা পৃথিবীতে সব থেকে জনপ্রিয় কারণ খুব জটিল কাজের প্রোগ্রাম লেখা কোনো একজন প্রোগ্রামারের পক্ষে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ

ব্যাপার। অনেক সময় অসম্ভবও বলা চলে। একটি ছবি আঁকার প্রোগ্রাম লেখার পিছনে তিন বছরের সময় বরবাদ করার থেকে তিন হাজার টাকা দিয়ে কোনো সফট্‌ওয়্যার লেখা পরীক্ষিত সফট্‌ওয়্যার কিনে নেওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। যাই হোক এ ব্যাপারে পরে বিশদ আলোচনা করা যাবে। আপাতত এটাই মনে রাখতে হবে, ফার্মওয়্যার সফট্‌ওয়্যার, দুটোই হলো কম্পিউটার প্রোগ্রাম। তবে ফার্মওয়্যারের কাজ কম্পিউটারকে চালু রাখা এবং এটি না থাকলে কম্পিউটার চালু থাকতে পারে না। ফার্মওয়্যার সাধারণত ROM-এ রেকর্ড করা থাকে। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ফার্মওয়্যার ROM এবং RAM, দু'জায়গয়াই থাকতে পারে। অবশ্য RAM-এর ফার্মওয়্যারটি ফ্লপি ডিস্ক বা হার্ড ডিস্ক থেকে লোড করে নিতে হয়। অপর পক্ষে সফট্‌ওয়্যার হলো কম্পিউটারকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রোগ্রাম। সাধারণত বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন সফট্‌ওয়্যার ডিস্ক বা ক্যাসেটে রেকর্ড করা অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিজেও BASIC, PASCAL, PROLOG ইত্যাদি কম্পিউটার ভাষায় বিভিন্ন কাজের সফট্‌ওয়্যার লিখে নিতে পারেন।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

- Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

- M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞানরচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।

- প্রেরিত রচনা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

- অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

ইলেকট্রনিক্স—ক্যুইজ Part X বিপ্লব ব্যানার্জী

1. A ও B দুটি Transformer। A ও B এই Transformer দ্বয়ের Secondary Voltage যথাক্রমে 6-0-6 এবং 6-0, এখন ঐ Secondary এর full wave rectification এর জন্য কোন ক্ষেত্রে কটি Diode লাগবে ?

2, PIV = ——

3. A ও B দুটি একই ধরনের ধাতব বস্তু এবং একই ভোল্টেজে ক্রিয়াশীল। এখন A ও B-র Diameter যথাক্রমে One Micron ও One Aungstrom হলে দুটির মধ্যে কার Charge density বেশী হবে ?

4. একটি L-C Series Circuit এর প্রান্তদ্বয়ে 1 Volt, 50 Hz প্রয়োগ করা হল। এখন ঐ Circuit এর Inductive Reactance এবং Capacitive Reactance পরস্পর সমান হলে ঐ Circuit এর মধ্য দিয়ে কত Current প্রবাহিত হবে যদি ঐ Circuit এর Physical Resistance হয় ROhm ?

5. CPO = ——

6. T. V Receiver এর ক্ষেত্রে Channel 2 থেকে Channel 13 পর্যন্ত Frequency range কত ?

7. F. M Band এর Frequency range কত ?

8. কয়েকটি বিশেষ ধরণের Microphones, Phonograph Pickups, Headsets এবং Loudspeakers তৈরী করিতে একটি বিশেষ ধরনের Piezoelectric effect গুণসম্পন্ন ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। সেই ক্রিস্টালটির নাম কি।

9. কোন ক্রিস্টালের thickness কমলে তার Fundamental Frequency বাড়ে। এই উক্তিটি ক) সর্বৈব্য মিথ্যা, খ) একদম ধ্রুব সত্য, গ) একটা আজগুবি গাঁজাখুঁড়ি গালগপ্প ঘ) একটি অবান্তর প্রশ্ন।

10. কোন একটি High Standard Electronic clock এর Frequency drift One Part in 10 Per day হইলে উক্ত Clockটি এক সেকেণ্ড Slow বা Fast হতে কত সময় নেবে ?

11. CMRR = —

12. Biomedical Electronics এর জগতে ECG কি অর্থ প্রকাশ করে ? অনুরূপে ঃ

13. EEG = —

14. EMG = —

15. EHG = —

16. ERG = —

17. Sensitivity of a Multimeter = ?

18. GAS = —

19. একটি Ohm মিটারের লাল তারটি (Red Probe) সত্যি সত্যিই Positive কিনা, কিভাবে বুঝবে ?

20. কোন একটি Multimeter এর full scale deflection এর জন্য 50 micro Ampere current প্রয়োজন হলে Meterটির Sensitivity হবে,—

— ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part X এর উত্তর —

1. A-র ক্ষেত্রে দুটি এবং B-র ক্ষেত্রে চারটি। 2. PIV = Peak Inverse Voltage. 3. B বস্তুটির charge density বেশী হবে। 4. $\frac{1}{R}$ Ampere. 5. CPO = Code Practice Oscillator. 6. 54 Mega Hertz থেকে 216 Mega Hertz পর্যন্ত। 7. 88 Mega Hertz থেকে 108 Mega Hertz পর্যন্ত। 8. Rochelle Salts. 9. (খ) 10·300 বৎসর। 11. CMRR = Common Mode Rejection Ratio. 12. ECG = Electro Cardiograph. 13. EEG = Electro Encephalograph 14. EMG = Electro Miograph. 15. EHG = Electro Histograph. 16. ERG = Electro Ratinograph. 17. Sensitivity = $\frac{1}{\text{Full Scale Deflection in Ampere}}$ 18. GAS = Gas Analysing Semiconductor. 19 কোন একটি জানা Diode যার Anode side এবং cathode sideটি আমাদের চেনা (যেমন IN4001 বা By127) এইরূপ একটি Diode এর Anode side এ সত্যিকারের positive এবং cathode side এ সত্যিকারের negative তার বা Probe ঠেকালে Meter এ Forward Biased mode এর মত deflection দেখাবে আর উল্টোটি হইলে Reverse Biased mode এর মত deflection দেখাবে। 20 20 Kilo Ohm per volt.

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা কল-61

অরণ্য

সৌমেন্দু পাল

বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয়রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অরণ্যের ভূমিকা ঃ

উদ্ভিদ যে শুধু আমাদের খাদ্য ও অক্সিজেন যোগায় তাই নয়, তারা বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয় রোধ করে আবহাওয়ার সমতা রক্ষা করে এবং সর্বতোভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের মধ্যে যদি প্রয়োজনের অনুপাতে বনভূমি না থাকে তাহলে এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছেন দেশের এই ভূমিক্ষয় ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা দূর করতে হলে দেশের মোট জমির অন্ততঃ শতকরা 33 3 ভাগ, বা এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি থাকা দরকার, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে জায়গায় আমাদের দেশে আছে তার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বনভূমি। সুতরাং অবিলম্বে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া শক্ত।

প্রতি বছর বর্ষায় বন্যা, গ্রীষ্মে খরা ও ভূমিক্ষয় রোধে উদ্ভিদের সংখ্যা ও অবস্থানের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। উঁচু জমিতে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন যদি সেখানে বনভূমির আচ্ছাদন থাকে তাহলে অধিকাংশ বৃষ্টির জলই বনভূমির বিরাট উদ্ভিদগুলি শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করে নেয়, জমির জলধারণের ক্ষমতা বাড়ে এবং গাছের পাতার মধ্য দিয়ে (প্রস্বেদন ক্রিয়ায়) ঐ জল আবার জলীয় বাষ্পরূপে বাতাসে ফিরে আসে, আবহাওয়ার শুষ্কতা তাতে দূর হয়। বনভূমি থাকার জন্য মাটির নীচে গর্ত করে বহু প্রাণী বাস করে এবং মাটির উপর ঝরা পাতা-লতা ও মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ ছড়িয়ে থাকায় মাটির জলধারণের মোট ক্ষমতা বাড়ে, তার ফলে বৃষ্টির সব জল আর নদীগুলিতে নেমে আসে না, বর্ষায় বন্যা হবার আশঙ্কা দূর হয়।

কিন্তু আমরা আজ নিজেদের চাহিদা মেটাবার জন্য বিচার-বিবেচনা না করেই ব্যাপকভাবে বনভূমির উচ্ছেদ সাধন করছি। তার ফলে মাটির জলধারণের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি হলেই মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি জল-পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সমস্ত মাটি সিমেন্ট বাঁধানো অঙ্গনের মত জলনিরোধক হয়ে ওঠে। তার ফলে বৃষ্টির প্রায় সমস্ত জলই ব্যাপকভাবে নদীতে গিয়ে পড়ে, শুধু তাই নয়, ঐ জলের সঙ্গে ধুয়ে বিপুল পরিমাণে মৃত্তিকা-কণাও পলির আকারে নদীর বুকে সঞ্চিত হয়। এইভাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। উদ্ভিদের আচ্ছাদন থাকলে এইভাবে ভূমিক্ষয় হত না। ভূমিক্ষয়-জাত পলি নদীর বুকে জমতে থাকায় নদীরও জলধারনের ক্ষমতা দ্রুত কমছে, এখন বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হলেই নদীগুলিতে বন্যা দেখা দেয়। কিন্তু উদ্ভিদ এই বন্যা-সৃষ্টিতে বাধা দেয়। কিভাবে বাধা দেয় তার আলোচনা আগেই করেছি।

পর্বতের উপর বনাঞ্চল থাকলে উচ্চবৃক্ষের ডালপালার উপর শীতকালে সঞ্চিত তুষাররাশি গ্রীষ্মের প্রথম থেকেই গলতে শুরু হত, গ্রীষ্মের সময় নদীগুলিতে ফলে যথেষ্ট জল পাওয়া যেত, খরার প্রকোপ তাতে দূর হত।

উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করে এবং অক্সিজেন (O_2) যোগান দেয় তা সকলেরই জানা। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে এবং ক্রমশঃ তা শ্বেতসার, প্রোটিন ও ফ্যাটে পরিণত হয়। এই সকল খাদ্য গ্রহণের জন্য আমরা প্রাণীরা উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন (O_2) বর্জন করে। উদ্ভিদের বর্জিত এই অক্সিজেনেই আমরা শ্বাসবায়ু রূপে গ্রহণ করি। এইভাবে উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের খাদ্য ও অক্সিজেনের যোগান দেয়।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা হ'ল কি খাদ্য উৎপাদনে, কি অক্সিজেন উৎপাদনে, খরা, বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে উদ্ভিদের ভূমিকা অনন্য ও বিকল্পহীন। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের (অরণ্যের) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়, শুধু তাই নয়, একটা সুষম অনুপাতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই অস্তিত্ব রক্ষা করা দরকার। এই অনুপাতটি বিপর্যস্ত হলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

দশম শ্রেণী, কামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, খামার গাছী, হুগলী।

সাগর কুসুম (Sea anemone)

শৈবাল কুমার গুহ

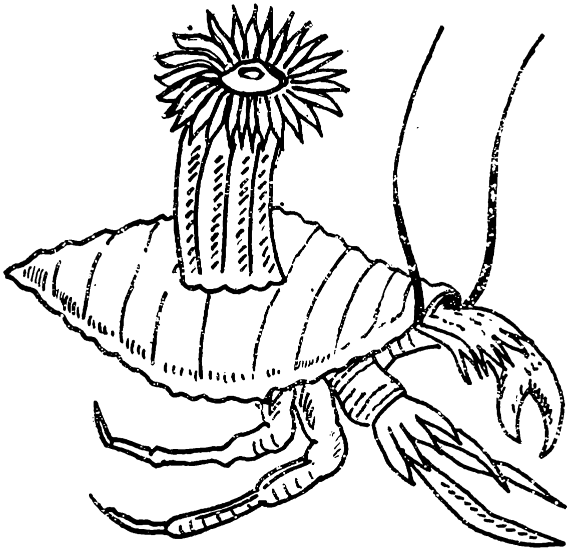

একপ্রকার প্রাণী আছে যারা রঙ-বেরঙের ফুলের রূপ ধরে শিকারের আশায় বসে থাকে সাগরের তলায় বালি-বালি-পাথরের খাঁজে। এদের বলা হয় সী অ্যানিমোন বা সাগরকুসুম। এরা প্রাণীজগতের সিলেনটারেটা বা একনালী-দেহী পর্বের অন্তর্গত। এরা বাস করে সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে। সাধারণতঃ পাথরের গায়ে লেপ্টে থাকে। এদের দেহ ছোট নলের মতো। তার চারদিকে মসৃণ চামড়া দিয়ে ঢাকা। এদের দেহগহ্বর তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে। চোষকের মতো ডিস্ক বা চাকতি দিয়ে এরা সমুদ্রের তলদেশে পাথরে আটকে থাকে। দেহের উপরের দিকে থাকে মুখ। মুখের চারদিকে চক্রাকারে ঘিরে আছে টেন্‌টাকল বা কর্ষিকা সাধারণতঃ ছয়ের গুণিতকে হয়। সাগর-কুসুমের কর্ষিকা। নানা আকারের ও রঙ-বেরঙের হয়। এক-একটির কর্ষিকা দেখতে অনেকটা ফুলের পাপড়ির মতো। সাগর-কুসুম যখন এই কর্ষিকাগুলো মেলে ধরে, তখন মনে হয় সমুদ্রের বুকে যেন ফুল ফুটে আছে। তাই তো এদের এরকম নামকরণ হয়েছে।

কর্ষিকাগুলি লাল, গোলাপী, নীল, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণের হয়। বর্ণবৈচিত্র্যে ও বর্ণ সুষমায় এদের তুলনা নেই। এদের আকারও কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েকফুট পর্যন্ত হতে পারে।

এরা সমুদ্রের তলদেশে খাদ্যের সন্ধানে সাধারণতঃ একই জায়গায় অবস্থান করে। তবে মাঝে মাঝে খুব ধীরে ধীরে একটু-আধটু নড়াচড়া করে। এদের-চলার গতি খুবই শ্লথ ঘণ্টায় মাত্র 3-4 ইঞ্চি। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এরা মাঝে মাঝে হারমিট ক্র্যাবের বা সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার খোলকের উপর লেপ্টে বসে, এবং তার পিঠে চড়ে, সমুদ্রের তলায় দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এগিয়ে যায়।

সাগর-কুসুমেরা মাংসাশী। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, শামুক-জাতীয় প্রাণী এবং ছোট ছোট মাছ। সাগর-কুসুমের কর্ষিকায় থাকে একপ্রকার কাঁটা। কর্ষিকাগুলির মাথায় থাকে সুক্ষ্ম ছিদ্র। আর কাঁটার নীচে থাকে একপ্রকার বিষের থলি। খাদ্য শিকারের বা আত্মরক্ষার জন্যে, সাগর-কুসুম অস্ত্র হিসাবে এই কাঁটা ব্যবহার করে। কর্ষিকার কাছাকাছি কোনো ছোট মাছ এলে, সাগর-কুসুম তার দেহে একসঙ্গে অনেকগুলি কাঁটা ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। এর ফলে মাছটি অবশ হয়ে যায়। তখন সে আস্তে আস্তে গোটা মাছটাকেই উদরাসাৎ করে ফেলে। এর ফলে তার শরীরটা তখনকার মতো ঢাউস হয়ে ওঠে খাদ্য গলাধঃকরণের সময় কর্ষিকাগুলো গুটিয়ে রাখে। আবার শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যেও সে কর্ষিকাগুলো এমনভাবে গুটিয়ে রাখে যে, তাকে একটা মাংসপিণ্ডের মতো দেখায়।

'সাগরটিয়া এলিগ্যান্স' নামের এক ধরণের সাগর-কুসুম অনেক সময় সাগরের নিচে কুঞ্জের গায়ে লেপ্টে থাকে। যেসব ডুবুরী স্পঞ্জ কুড়ায়, এরা তাদের হাতে বিযাক্ত হুল ফুটিয়ে দেয়। এর ফলে ডুবুরীর মৃত্যু ঘটতে পারে। পরস্পর সহযোগিতার এ এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইরকম সাগর-কুসুম সাধারণতঃ ভূমধ্য-সাগরেই বেশি দেখা যায়।

হারমিট ক্র্যাব (Hermit crab) বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, অনেক সময় সাগর-কুসুমকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এরা শত্রুর গায়ে তাদের খোলকে লেপ্টে থাকা সাগর-কুসুমের কাঁটা ফুটিয়ে দেয় এবং সেইভাবে আত্মরক্ষা করে।

কিছু সাগর-কুসুমের মধ্যে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ মিথো-জীবী হিসাবে বসবাস করে। এইসব সাগর-কুসুমের রঙ সবুজ হয়।

সাগর-কুসুম কয়েশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সাগর-কুসুম সহজেই অ্যাকোয়ারিয়ামে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। একজন জীববিজ্ঞানী সাগর তলের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে একটি সাগর-কুসুমকে রেখেছিলেন। এই সাগর-কুসুমটি সেখানে সত্তর বছর বেঁচেছিল।

5/3 এ ওলাই চণ্ডী রোড, কলকাতা 37

কলম কে আবিষ্কার করেন ?

লতিকা দত্ত

সভ্যতার অগ্রগতিতে লেখা বা রচনা জিনিসটির অবদান হলো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, লেখা দিয়েই তার ভাবনাচিন্তার ধারা ও কাজের প্রণালীগুলো অক্ষরে বন্দী করে রাখতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কলম তৈরির আগে এই লেখার উদ্দেশ্যে মানুষ অনেক রকম উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আদিকালে মানুষ লেখার জন্যে ছুঁচলো পাথরের খণ্ড ব্যবহার করতো। এই দিয়ে তারা গর্ত বা গুহার গায়ে আঁচড় কেটে কোনো ঘটনা বা বিবরণের তালিকা লিখতো, ছবিও আঁকতো। এমন কি উদ্ভিদ গুল্মের রসে বা কোন জন্তুর রক্তেও নিজের আঙুল ডুবিয়ে নিয়ে তা কলম হিসেবে ব্যবহার করতো। পরে সে মাটির পিণ্ড এবং চকের গুঁড়োও কাজে লাগাতো। চীনারা তাদের অক্ষরগুলো উটের লোমে তৈরি খুব সূক্ষ্ম ব্রাস দিয়ে রঙ করে দিতো।

খুব সম্ভব ইজিপ্টের অধিবাসীরা প্রকৃত কলম তৈরি করে। আজকাল কলমে ইস্পাতের যে-তীক্ষ্ণ আগা বা মুখ থাকে ঠিক তেমনি করে তারা তামার তৈরি আগা বা মুখ একটা ফাঁপা ডাঁটের প্রান্তে বসিয়ে দিতো। প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রথম অক্ষরের হাতের লেখার কৃতিত্ব গ্রীক জাতির। তারা যে কলম ব্যবহার করতো তা ধাতু, হাড় বা হাতীর দাঁত দিয়েই তৈরি হতো আর তারা লিখতো মোমে লেপা ফলকে। তারও পরে ফাঁপা নলের মতো তৃণ দিয়ে চেরা কলম তৈরি করতো। কালির মতো জিনিসে ওটা ডুবিয়ে নিয়ে খাগড়া পাতায় লিখতো। এই খাগড়া গাছ থেকে পুরাকালে কাগজ তৈরি হতো।

মধ্য যুগে যখন কাগজ প্রচলিত হলো তখন মানুষ জানালো যে রাজহাঁস, কাক বা মরালের ল্যাজ অথবা ডানার পালক দিয়ে কলম তৈরি করা যায়। এর আগাটা তীক্ষ্ণ এবং চেরা, সেজন্যে কালিটা নালী দিয়ে সোজা বয়ে কাগজে যেতে পারতো। আর মজার কথা এই যে, ইংরেজি পেন (Pen) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন পেন্না (Penna) শব্দ থেকে। Penna শব্দের মানে হলো পালক (Feather)। যদিও পালকের তৈরি কলম দীর্ঘদিন চলেনি তবু মনে রাখা ভালো যে প্রায় হাজার বছর ধরে এই কলমই মানুষের লেখার যন্ত্র বা উপায় স্বরূপ ছিল।

1780 খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইস্পাতের কলম তৈরি হতে শুরু হলো। কিন্তু চল্লিশ বছরের আগে এই কলম তেমন জনপ্রিয় হয় নি।

আধুনিক যুগের ফাউন্টেন পেন বা ঝরণা কলম (Fountain pen) 1880তে সর্বপ্রথম ইউনাইটেড্ স্টেটস্ (United States)-এ তৈরি হয়। এই কলমের নিব্ (Nib) সাধারণতঃ চোদ্দ ক্যারাটের সোনা দিয়ে তৈরি হয় ও এর আগা বা মুখ প্ল্যাটিনাম জাতীয় ধাতু ইরিডিয়াম বা অসমিরিডিয়াম দিয়ে তৈরি। এগুলো মসৃণ এবং শক্ত ধাতু। এজন্যে কলমটা দিয়ে লিখতে গেলে কাগজে আঁচড় পড়ে না বা কাগজ ছ'ড়ে যায় না। আর ভেতরের দিকে সাধারণতঃ রাবার অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি নল থাকে। এই নলে কালি ভরে রাখা যায়।

কলমের আগায় যে অতি সূক্ষ্ম একটি বল থাকে সেই কলমের আবিষ্কার হয় বিশ শতকে। কলমের আগার প্রান্তটি ক্রোম্ (chrome ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বলটি অতি ছোট। এর ব্যাসরেখা হলো প্রায় এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের মতো। বলটা ওরই আকার অনুযায়ী একটা গর্তে ফিট্‌ফাট্ বসানো। এটাকে যখন লেখার কাগজে টেনে নেওয়া হয় তখন এটা গোলাকারে ঘুরে চলে। ভেতরে কালির সঞ্চয় কোঠা থেকে সে কালি নিয়ে নেয়।

100 যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-68

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
আরে, চুনো আবার গো-পালন শুরু করলো কবে থেকে!
কিরে খুদে, কোথায় চললি?
তোর কাছেই যাচ্ছিলুম। তা-হঠাৎ গরু পোষার শখ হল কেন?
গরু!
বাঃ, সিঙ্গাপুরী কলা খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে চলেছিস, আবার ঝুটা বাত।
ইয়াঃ! আমার কলা!
হতচ্ছাড়া জানোয়ার আমার সব কলা সাবড়ে দিয়েছে!
গরুটা যে ভাবে তোর পেছু পেছু যাচ্ছিল—ভাবলুম বুঝি তোদের পোষা!

তুই একটা আস্ত গরু, তাই বুদ্ধিটাও ওঁ গরুর মতো !
সরি, আমারই ভুল হয়ে গেছে। তবে সব খায়নি এখনও দুটো কলা রয়েছে।
ও দুটো রাখা ঠিক নয়। গরুটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।
আরে, তাই তো ! রাসকেলটা কেমন ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছে। তুই এ দুটো সামলা।
চটপট কলা দুটো খেয়ে নিয়ে ওকে কলা দেখা, নয়তো ওইই তোকে উল্টে কলা দেখাবে। নে-ধর্।
বাড়িতে জানতে পারলে-
আহা, যেন অমৃত !
আমার এক ডজন কলা স-ব গেল।
এই কলা জানবি ফুল্ অফ্ ভিটামিনস্। মানুষের শরীরে লোহা একটা ভাইট্যাল উপাদান—তা এই কলাতে প্রচুর পরিমাণে থাকে।
লোহা !
ইয়েস্, এ খনিজ ধাতু, মানে ইংরেজীতে যাকে বলে আয়রন।
মানুষের শরীর রক্ত মাংস হাড় ইত্যাদি দিয়েই তৈরী জানি, এতে আবার লোহা-লক্কড়ের কারবার কবে থেকে শুরু হল ?
হাঃ হাঃ হাঃ, এ লোহা তোর সে লোহা নয়। এ লোহা আছে দ্রবীভূত অবস্থায়।

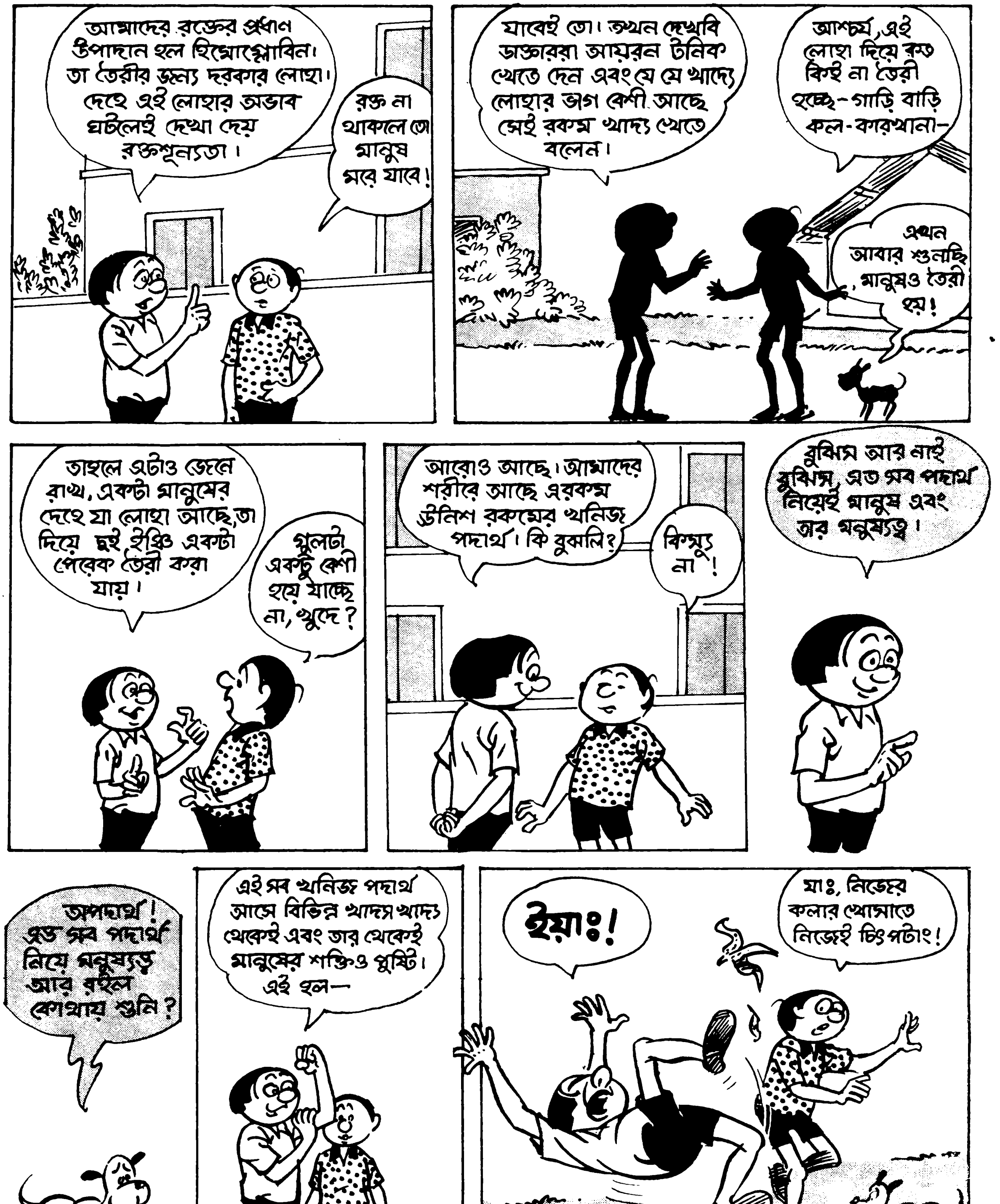
আমাদের রক্তের প্রধান উপাদান হল হিমোগ্লোবিন। তা তৈরীর জন্যে দরকার লোহা। দেহে এই লোহার অভাব ঘটলেই দেখা দেয় রক্তশূন্যতা।
রক্ত না থাকলে তো মানুষ মরে যাবে!
যাবেই তো। তখন দেখবি ডাক্তাররা আয়রন টনিক খেতে দেন এবং যে যে খাদ্যে লোহার ভাগ বেশী আছে সেই রকম খাদ্য খেতে বলেন।
আশ্চর্য, এই লোহা দিয়ে কত কিই না তৈরী হচ্ছে—গাড়ি বাড়ি কল-কারখানা—
এখন আবার শুনছি, মানুষও তৈরী হয়!
তাহলে এটাও জেনে রাখ, একটা মানুষের দেহে যা লোহা আছে, তা দিয়ে দুই ইঞ্চি একটা পেরেক তৈরী করা যায়।
গুলটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না, খুদে?
আরোও আছে। আমাদের শরীরে আছে এরকম উনিশ রকমের খনিজ পদার্থ। কি বুঝলি?
কিস্সু না!
বুঝিস আর নাই বুঝিস, এত সব পদার্থ নিয়েই মানুষ এবং তার মনুষ্যত্ব।
অপদার্থ! এত সব পদার্থ নিয়ে মনুষ্যত্ব আর রইল কোথায় শুনি?
এই সব খনিজ পদার্থ আসে বিভিন্ন খাদ্যাখাদ্য থেকেই এবং তার থেকেই মানুষের শক্তিও পুষ্টি। এই হল—
ইয়াঃ!
যাঃ, নিজের কলার খোসাতে নিজেই চিৎ পটাং!

উল্লুকাঁহেবলা! একটুও কমনসেন্স নেই? খোসাটা একটু দেখে শুনে ফেলতে পারিসনি?
আমার কলাটা তো পকেটে, এই দ্যাখ।
ওরে বিচ্‌কেল, কলাটা না খেয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে! কিপটেমী? সুতরাং এ কলাটা আমাকেই দে, আর তুই কাঁচ্‌কলা খা।
যাঃ কলা!
এটা কি হলো?
চোখ মেলে দ্যাখ কি হয়।
অ্যাঁইঃ!
হাউমাস্‌!
রাসকেল, ইডিয়েট, গরুকাঁহেবলা!
তখন থেকে আমাকে গরু গরু বলছে! বড্ড সাহস হয়েছে না?
বাঁচাও-ও-ও-ও-ও-ও

নীল সাগরের রহস্য

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বারো

এই ঘরে কোনো আলো নেই। সুইচগুলো কাজ করছে না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে শংকরকাকাই প্রথম কথা বললেন, 'এই জন্যই তোকে বলেছিলাম সৃজন, পুলিশ বোট এলে আমাদের অভিযান শুরু করব। তাহলে আজ আমাদের এই হাল হতো না। তা ছাড়া আমার বন্দুক, তোর রিভলভার দু'টোই তো ব্যাটারা কেড়ে নিল—

অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম, কাকার মুখ গম্ভীর। ফিসফিস গলায় সৃজনকাকা বললেন, হ্যাঁ, বন্দুক রিভলভার নিলেও, নিতে পারে নি এই মিনি ড্রিল মেশিনটা। এটা আমার প্যান্টের ভেতরের পকেটে লুকোনো ছিল—'

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কই দেখি দেখি, কী জিনিস—'

চাপা গলায় ধমকে উঠলেন কাকা, 'আঃ, এত চেঁচাচ্ছিস কেন? বাইরে পাহারা রয়েছে না—'

সত্যিই তাই। বাইরে এতক্ষণ বুটের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এখন হঠাৎ সেটা বন্ধ। অর্থাৎ পাহারাদার এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছিল। এখন আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হয়তো আমাদের কথা বোঝবার চেষ্টা করছে।

সৃজনকাকা চাপা গলায় বোঝাচ্ছিলেন মিনি ড্রিলের কাজকর্ম, 'যে কোনো কাঠ বা সিমেন্টের দেওয়াল ফুটো করতে এই মেশিনের লাগে এক থেকে তিন মিনিট। তাছাড়া কোনো শব্দ হয় না। শুধু তাই নয়, এটার ভেতরে একটা ছোরাও লুকোনো আছে। এই দেখ, সুইচটা টিপলেই—'

কাকা হাতের ছোট মেশিনটাকে নিয়ে জানলার কাছে গেলেন। জানলা দিয়ে বাইরের আলো অল্প আসছিল। সেই আলোয় মেশিনের একটা সুইচ টিপতেই ভেতর থেকে অদ্ভুত কায়দায় বেরিয়ে এলো ছোরা। ছোট সরু, কিন্তু প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ ধার।

ছোরাটা দেখে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডঃ শ্রীবাস্তব আমার মুখে হাতচাপা দিলেন, 'চুপ বাদল চুপ—'। তারপর সকলের দিকে ফিরে বললেন, 'ঐ যে দেখুন, দূরের ঐ বাড়িটা—'

আমরা সবাই ডঃ শ্রীবাস্তবের কথা মতো জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম দূরে গোটা দুই বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়ি দুটোকে ঘিরে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওই বাড়িটাতেই থাকেন মিঃ সোম আর মিঃ লী। মিঃ সুজুকি দিন কয়েক হলো এসেছেন এখানে।'

'কী করে এলেন? জাহাজে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না। ছোট এরোপ্লেনে চেপে। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ না একটু দূরে একটা প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদিন হলো ছোট প্লেন নামবার মতো একটা ছোট রানওয়ে তৈরি করে নিয়েছেন মিঃ সোম—'

গম্ভীর গলায় বললেন কাকা, 'তাহলে দেখছি, খুব করিৎকর্মা লোক এই সূর্য সোম। এর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কবজিতে বেশ জোর দরকার। আচ্ছা ডঃ শ্রীবাস্তব, আপনি তো মিঃ সোমকে বেশ কিছুদিন ধরে দেখছেন। লোকটার পরের প্ল্যানটা কী হবে বলতে পারেন?'

ধীর স্থির শান্ত গলায় জবাব দিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব, 'বলা খুবই সহজ। কাল সকালবেলাতেই মিঃ সোম আপনাদের জাহাজটাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেবে। কারণ একবার জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারলে আমরা তো হাতের মুঠোয়।

'তারপর কি লোকটা আমাদের খুন করবে?' আমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো হঠাৎ!

খুব নরম গলায় উত্তর দিলেন শ্রীবাস্তবচাচা, 'না ঝট করে আমাদের বোধহয় খুন করবে না। তাছাড়া আমরা

যদি ওদের কথামতো চলি, তাহলে হয়তো ভালোভাবেই রাখবে আমাদের।'

ডঃ শ্রীবাস্তবের কথা শুনে আমরা সবাই চুপ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো মুখেই কোনো কথা নেই। জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা অল্প আলোয় দেখলাম, ঘরের মধ্যে চারটে খাট, তার ওপরে বিছানা। একটা টেবিল, দু'তিনটে চেয়ারও আছে এ ঘরে।

সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু করে এই রাত এগারোটা পর্যন্ত শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছে। এখন বিছানা দেখে তার ওপর শুয়ে পড়লাম। আমার দেখাদেখি অন্যরাও খাটের ওপর বসলেন।

আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম, সেখান থেকে জানলা দিয়ে দেখা যায়, দূরের ড্রিলিং ডেরিকটা। একটা লোহার কাঠামো, আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। খাটের ওপর উঠে বসে বললাম, 'আচ্ছা শ্রীবাস্তবচাচা, ঐ যে দূরে ড্রিলিং ডেরিক। ওখানে কি কাজ হচ্ছে এখন?'

'হ্যাঁ। শুধু এখন নয়, সারা দিনরাতই কাজ চলছে ওখানে। ড্রিলিং করে একবার পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেলে সারাক্ষণই কাজ চালিয়ে যেতে হয়। থামা যায় না—'

এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল। একজন বেয়ারা ঢুকল। হাতে চার থালা খাবার। আর একটা বড় জারের মধ্যে জল। বেয়ারা অবশ্য একলা ঢোকে নি। ওর পেছনে বন্দুক হাতে একজন পাহারাদার। ঘরে একটা লণ্ঠনও রেখে গেল ওরা।

খাবার অবশ্য খুবই মামুলী। রুটি আর তরকারী। তবু খিদের মধ্যে খেতে মন্দ লাগল না। খাওয়ার পর আমার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা' নিজেরই ঠিক মনে নেই।

হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিঃ সোম, মিঃ লী আর মিঃ সুজুকি। আর ঘরের বাইরে তিন চারজন পাহারাদার।

জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ চোখে পড়ল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।

গম্ভীর গলায় মিঃ সোম বললেন, 'দেখুন মিঃ বোস। আমাদের সর্ত আপনাদের না মেনে আর উপায় নেই। কারণ আপনাদের জাহাজ আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এই দ্বীপ থেকে আপনাদের পালাবায় আর কোনো উপায় নেই। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

মিঃ সোমের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন সৃঞ্জনকাকা, 'আপনাদের সর্ত কী জানতে পারি কি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সবই বলব আপনাদের—' হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সূর্য সোম।

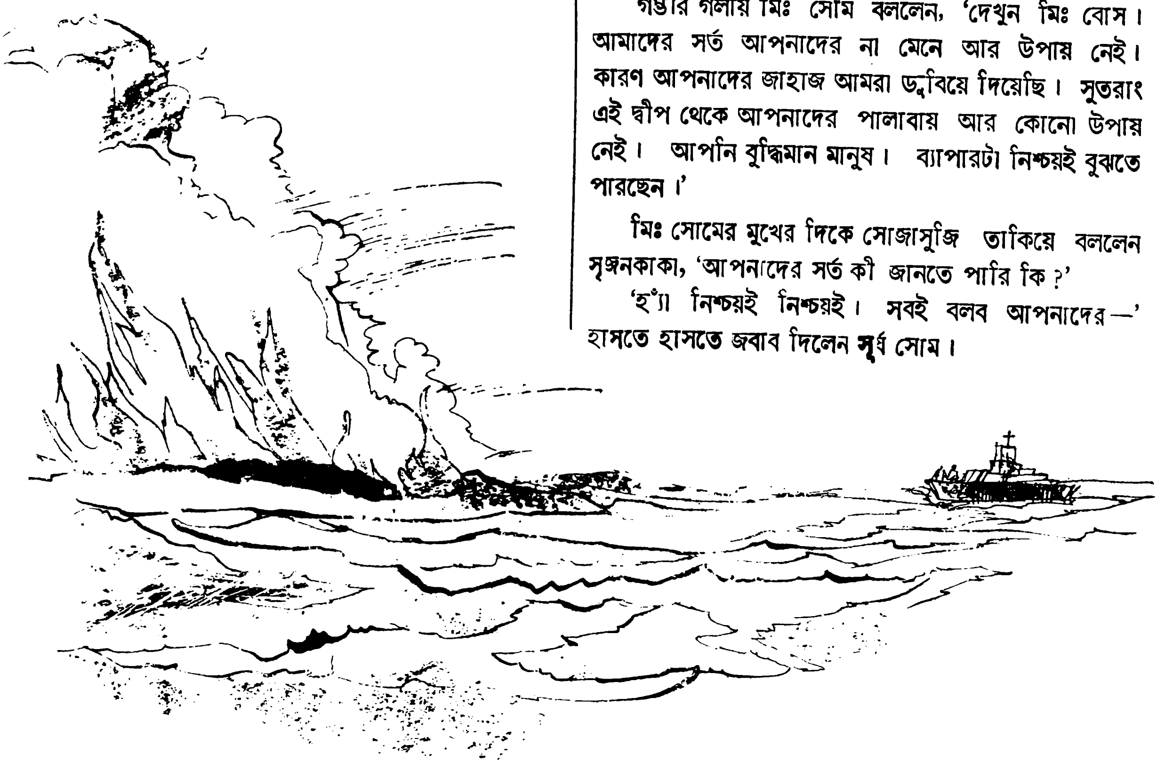

এরপর সূর্য সোম ফিস ফিস করে কী যেন আলোচনা করলেন মিঃ লী আর মিঃ সুজুকির সঙ্গে।

'হ্যাঁ শুনুন মিঃ বোস। আমাদের সর্ত খুবই সহজ সরল। দেখুন আমাদের এখানকার কাজ সারতে আর মাত্র চার-পাঁচ মাস লাগবে। তারপর এখান থেকে আমরা গুটিয়ে ফেলব। এই চার-পাঁচ মাস আমাদের অতিথি হয়ে থাকুন। আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না। ইচ্ছে করলে আমাদের কাজে সাহায্যও করতে পারেন। সেই কাজের বিনিময়ে টাকা পয়সাও পাবেন—' কথা বলতে বলতে একটু দম নিলেন মিঃ সোম। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা, চিঠি লিখে গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিন, দ্য কেস ইজ ক্লোজড্। তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন সৃজনকাকা। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, মিঃ সোম। কিন্তু আমাদের পক্ষে আপনাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া সম্ভব নয়। কিছুতেই না। কারণ আপনারা অন্যায় করছেন। এক দেশের তেল আপনারা এভাবে ড্রিল করে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছেন আপনারা—'

কাকার কথা শেষ হওয়ার আগে গর্জে উঠলেন মিঃ সোম, 'ভুল কথা। এই দ্বীপটা যে ভারতের মধ্যে, তা সারভে অফ ইনডিয়ার কোনো ম্যাপে দেখানো নেই—'

'হয়তো দেখানো নেই। কিন্তু এই দ্বীপের অবস্থান ভারতের সামুদ্রিক জলসীমানার মধ্যে। তাই এটাও ভারতেরই একটা দ্বীপ—'

'দেখুন, মিঃ বোস, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক করবার সময় আমাদের নেই। ইচ্ছেও নেই। আমরা মানুষ খুন পছন্দ করি না। তাই আমরা আপনাদের আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তবু যদি আপনারা আমাদের প্রস্তাব না মানেন, তাহলে আপনাদের চারজনকে মাঝ সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসবে আমাদের মোটর বোট তারপরের ব্যবস্থাটা হাঙ্গরেই সারবে আশা করি। হাঃ হাঃ—'

পাগলের হাসি আর থামতেই চায় না। সেই হাসির দমকে কাঁপতে থাকে ঘরের চেয়ার টেবিল খাট সব কিছু।

সৃজনকাকার ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় হঠাৎ দেখি,

ঐ বাড়িটাতে থাকেন মিঃ সোম আর মিঃ লী......

ঘরের মধ্যে সূর্য সোম লী বা সুজুকি—কেউ নেই। সেই আগের মতো ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার বাইরে ভারী জুতোর মশমশ আওয়াজ। আমি কি তবে ঘুমোচ্ছিলাম? কিন্তু স্বপ্ন কী করে এত স্পষ্ট হয়?

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দেখলাম, আকাশ এখনো অন্ধকার। অর্থাৎ ভোর হতে এখনো বাকি।

ওপাশে খাটে শংকরকাকা আর শ্রীবাস্তবচাচা মাথা নিচু করে বসে কী যেন ভাবছেন?

ফিস ফিস করে কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন থেকে পালাবার কোনো ফন্দী ফিকির বের করতে পারলে?'

হতাশ গলায় কাকা বললেন, 'নাঃ এখনো পারি নি। এই বাড়িটাকে ঘিরে এদের বড় কড়া গার্ড—'

কান না পাতলেও দরজার বাইরে শোনা যায় ভারী জুতোর মশমশ আওয়াজ। এই আওয়াজ কি থামবে না?

[চলবে]

কার্টুন : শৈল চক্রবর্তী

ওড়ন বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছে কিন্তু শব্দদূষণ তত্ত্বটা শেখা হয় নাই

বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে

অদ্রীশ বর্ধন

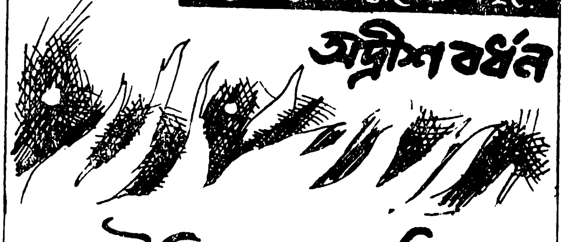

অলৌকিকের আঙিনায়

জীবনে এমন এক একটা সময় আসে, যখন অলৌকিক কাণ্ড ঘটানোর জন্যে প্রার্থনা করতে হয় আকুল ভাবে। নিঃসীম নিরাশার মধ্যে সত্যিই যেন প্রার্থনার জবাব আসে—অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যায়। যেমন, জাহাজডুবি হয়ে তেষ্টার জল না পেয়ে যারা মরতে বসেছে ধু-ধু মহা-সমুদ্রে, আচমকা তারা লোনা সমুদ্রের মাঝে অদ্ভুতভাবে মিষ্টি জলের অঞ্চলে পৌঁছে যায়। গলায় ফাঁস লাগানো দড়ি দুর্জ্ঞেয় কারণে ছিঁড়ে যায়। গনগনে আগুনের ওপর হেঁটে যায় আগুন হাঁটিয়ে। মৃত্যুর বহুবছর পরেও কারও দেহে পচনের চিহ্ন দেখা যায় না—বরং দেহ থেকে পাওয়া যায় আশ্চর্য সুবাস। কেউ স্রেফ হাত বুলিয়ে দুরারোগ্য অসুখ সারিয়ে দেয়, পঙ্গুকে সুস্থ করে তোলে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব ঘটনার কোনও যুক্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ক্যান্টারবেরির প্রাক্তন আর্চবিশপ ডক্টর উইলিয়াম টেম্পল বলেছেন ঃ প্রার্থনা করলে কাকতালীয় যেন ঘটে যায়—না করলে ঘটে না। অর্থাৎ, এক-জনের কাছে যা কাকতালীয় অন্যজনের কাছে তা মির‍্যাকল্।

মোদ্দা কথা, শরীর আর মনের ক্ষমতা সুগভীরভাবে রহস্যময়। প্রকৃতি অথবা বিজ্ঞানের কানুন দিয়ে অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ মানুষ তখন সে সব ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিজ্ঞানের যুক্তিতে এ সব ঘটনা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু বিশ্বজুড়ে তোলপাড় হওয়া ঘটনাগুলি তো নথি-বদ্ধ হয়ে আছে অনেক জায়গায়। সেই নথিভুক্ত ঘটনারই কিছু বিবরণ দিচ্ছি এই সংখ্যায়।

যে জিভের মৃত্যু নেই

মৃত্যুর এক বছর পরে পাদুয়া-র সেন্ট অ্যান্টনীকে (1106-1231) সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করা হয়। জীব-দ্দশায় তাঁর বাগ্মিতা দেশশুদ্ধ লোককে বিহ্বল করে তুলে-ছিল। মৃত্যুর 400 বছর পরে তাঁর কফিন খুলে দেখা গেল ধূসর ধুলোয় পরিণত হয়েছে সন্ত অ্যান্টনীর নশ্বর দেহ—কিন্তু অবাক কাণ্ড ! এই ধুলোর মধ্যে তখনও নরম, গোলাপী এবং তাজা অবস্থায় রয়েছে তাঁর সেই জিভ—যেন বেঁচে রয়েছে তখনও !

বাগ্মিতা মৃত্যুকে কিভাবে ঠেকিয়ে রাখে তার একটা ঘটনা বলা যাক। 1702 সালে ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মা-বলম্বীরা রাজসৈন্যের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যায় ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শে। নেতাদের মধ্যে একজন ঠিক করলেন আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন তিনি মিথ্যে বলছেন না।

নাম তাঁর ক্ল্যারিস। 600 লোকের সামনে তিনি চিতায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আগুন জ্বালানো হল। লেলিহান শিখায় তিনি ঢেকে গেলেন। কিন্তু বিরাম বিহীন ভাবে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। আগুন তাঁকে ঘিরে তার মাথা ছাড়িয়ে লকলক করতে লাগল ওপরে—তাঁকে আর দেখা গেল না—শোনা গেল কেবল অচঞ্চল কণ্ঠের বক্তৃতা। আগুন যখন কমে এল, বক্তৃতা থামল না। সব কাঠ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল তখন চুপ করলেন ক্ল্যারিস। অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন ছাই মাড়িয়ে ফোস্কা তো দূরের কথা, গায়ে কোন আঁচ লাগেনি, জামাকাপড়ও ঝলসায় নি !

নশ্বর দেহ কবরেও অবিনশ্বর

পোল্যাণ্ডের সন্ত অ্যানড্রু বোবোলাকে নৃশংসভাবে খুন করে হানাদার কশাকরা (1657)। তখন তাঁর বয়স 67। মৃতদেহ পড়ে থাকে গোবরের গাদায়। কশাকরা বিদেয় হওয়ার পর দেহটাকে কবর দেওয়া হয় স্থানীয় গির্জের কবর খানায়।

88 বছর পরে স্থানীয় কলেজের রেক্টর স্বপ্নে নির্দেশ পান—কবর খুলে সন্তর দেহ বাইরে আনাহোক। তাই করা হল এবং দেখা গেল শরীরে এতটুকু পচন ধরে নি—সজীব দেহর মতই তা নমনীয় !

1730 সালে সরকারীভাবে দেহটা পরীক্ষা করেন ছজন পাদরী আর পাঁচজন ডাক্তার। একবাক্যে তাঁরা রায় দিলেন মৃত্যুর 73 বছর পরেও শরীরে পচন ধরে নি এতটুকু শক্তও হয়নি।

আরও দেখা যায় যে ভল্টে ফাদার বোবোলার নশ্বর দেহ অবিনশ্বর থেকে গেছে, সেই একই ভল্টে রক্ষিত অন্যান্য নশ্বর দেহগুলো কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চলেছে !

মৃত্যুর 107 বছর পরে লাদ্রোনি দ্বীপের মারিয়া আনার মৃতদেহ তুলে পরীক্ষা করেছিলেন 11জন ডাক্তার (1731)। অবাক হয়ে গেছিলেন শরীরে একদম পচন ধরেনি দেখে। বরং, শরীরে বেশ নরম নমনীয় অবস্থায় রয়েছে। সেই সঙ্গে সুগন্ধি বৃক্ষ নির্যাসের মত অদ্ভুত একটা সুগন্ধ মৃতদেহ থেকে ভুর ভুর করে বেরোচ্ছে! এ গন্ধ আসছে বিচিত্র একটা

তৈলাক্ত পদার্থ থেকে। সন্ন্যাসিনীর পোশাক, চামড়া আর ভেতরকার দেহ যন্ত্র নিষিক্ত হয়ে রয়েছে এইসুগন্ধি পদার্থে।

শলংচিকিৎসকরা দেহ নিয়ে কাটা ছেঁড়া শুরু করে দেন—সুগন্ধি তেলের উৎস জানবার জন্যে। কিন্তু রহস্যের কিনারা করতে পারেন নি। যতই কাটাছেঁড়া করেছেন, সুগন্ধ তত বেশী ঘন হয়েছে। একজন সার্জন তো দিন কয়েক হাত পর্যন্ত ধুতে চাননি গন্ধ হারিয়ে ফেলার ভয়ে!

এ কাহিনী ছাপা হয়েছে ফিজিক্যাল ফেনোমেন্যা অব মিস্টিসিজম' গ্রন্থের 260-61 পৃষ্ঠায়।

যাকে ফাঁসি দেওয়া যায় না

1803 সাল, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

খুন হয়ে গেল একজন পুলিশ। ডেস্ক ভেঙে সোনা আর রূপোর মুদ্রা চুরি করছিল একজন চোর অথবা চোরেরা। ধরতে গিয়ে প্রাণ দিল পুলিশ বেচারা।

অচিরে গ্রেপ্তার করা হয় জোসেফ স্যামুয়েল নামে কুখ্যাত এক ব্যক্তিকে। চোরাই মুদ্রা কিছু পাওয়া গেল তার পকেটে। খুনের দায় তার কাঁধে চাপানো হলেও সে তা মানতে চাইল না কিছুতেই। খুন সে করেনি—চুরি করতে পারে। যাই-হোক, ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল স্যামুয়েলের।

কুকর্মের সঙ্গী হিসেবে আইজ্যাক সিমন্ড নামে এক-জনকেও জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। সে কিন্তু কোন অপরাধই কবুল করে নি। খুন তো করেই নি, চুরিও করেনি।

জনগণের সামনে স্যামুয়েলকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানোর দিন আইজ্যাককে আনা হল সেখানে—যদি পেট থেকে কথা বের করা যায়, এই আশায়।

স্যামুয়েলকে আনা হয়েছে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে। গলায় তার ফাঁসির দড়ি। জল্লাদ ইসারা করলেই ঘোড়া দৌড়োবে গাড়ি নিয়ে—স্যামুয়েল ঝুলবে ফাঁসি কাঠে।

জল্লাদ বললে—"ওহে স্যামুয়েল, মরবার আগে কিছু বলে যাও।" প্রশান্ত কণ্ঠে স্যামুয়েল তক্ষুনি বললে—"হ্যাঁ, চুরিতে সাহায্য করেছি আমি ঠিকই, কিন্তু খুন করি নি। খুনী দাঁড়িয়ে আছে ঐখানে। নাম তার আইজ্যাক সিমন্ড।"

শুনেই গাঁ-গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল আইজ্যাক—যাতে স্যামুয়েলের কথা কেউ শুনতে না পায়। জনতা কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠছে দেখে জল্লাদ আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না। ফাঁসির হুকুম কার্যকর করতেই হবে। ইসারা করতেই ঘোড়া ছুটল তিড়বিড়িয়ে—স্যামুয়েলের পায়ের তলা থেকে ছিটকে গেল গাড়ি—দড়িতে ঝুলে পড়ল স্যামুয়েল....

তৎক্ষণাৎ পটাং করে ছিঁড়ে গেল দড়ি!

জনতাকে আর তো রোখা যাচ্ছে না! প্রহরীরা ঘিরে রাখল স্যামুয়েলকে। ঝটপট আর একটা ফাঁস তৈরি করে গলিয়ে দেওয়া হল স্যামুয়েলের গলায়। সে বেচারী তখন ধুঁকছে, দাঁড়াতে পারছে না—তাই বসিয়ে দেওয়া হল একটা পিপের ওপর। আবার ছুটল ঘোড়া, আবার দড়িতে ঝুলে পড়ল স্যামুয়েল...

কিন্তু একী! আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে গেল ফাঁস! আস্তে আস্তে মাটিতে পা ঠেকল স্যামুয়েলের! ধড়ে প্রাণ রয়েছে তখনও!

জনতাকে আর কি আটকানো যায়? তারা তো বুঝে ফেলেছে, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন স্যামুয়েলকে পর-পর দুবার। অতএব...

গোঁয়ার জল্লাদ কিন্তু ফাঁসি দেবেই। আবার ফাঁস পরালো গলায়। আবার পটং করে ছিঁড়ে গেল দড়ি!

হৈ হৈ করে অত লোক তেড়ে আসছে দেখেই ভোঁ দৌড় দিল জল্লাদ। গভর্ণরকে গিয়ে সব খবর বলতেই তিনি খালাস করে দিলেন স্যামুয়েলকে।

জল্লাদের মনের খটকা কিন্তু গেল না। তিনটে ফাঁসির দড়ি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে, চারশ পাউন্ড ওজন ঝোলালেও কোন দড়িই ছিঁড়ছে না বা ফাঁস খুলে যাচ্ছে না—অথচ কম ওজনের স্যামুয়েলের ক্ষেত্রে তিন-তিনবার দড়ি তিনটে বেইমানি করেছে।

বিচার হল আইজ্যাক সিমন্ডের। ফাঁসি হয়ে গেল যথা সময়ে। এবার আর দড়ি ছিঁড়ল না!

আগুন যার পায়ের ভৃত্য

স্যার উইলিয়াম ক্রুকস তো নামী বিজ্ঞানী। প্রেতচক্রে যাতায়াত ছিল তাঁর। তাঁর নিজের লেখা একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে জানা যায় 1873 সালের 28 এপ্রিল মিঃ হোম নামে এক আগুন-জয়ী মিডিয়ামের কাণ্ডকারখানা রীতিমত অবিশ্বাসীরও মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রেতাত্মাকে আবাহন করে এই মিডিয়াম জ্বলন্ত আগুনের চুল্লীতে নিজের ঝাঁকালো চুলওলা মাথা ঢুকিয়ে দিতেন, গনগনে কয়লা হাতে নিয়ে অন্যের হাতে দিতেন—কারোরই হাতে গরম পর্যন্ত লাগত না। একই অঙ্গারে হয়ত কারও আঙুলের ডগায় ফোস্কা পড়ে যেত—আগুনটা যে সত্যিই আগুন, ধোঁকাবাজি নয়—এটা যাচাই করানোর জন্যে প্রেতাবিষ্ট মিঃ হোম এই কাণ্ড করতেন। একই আগুন মুঠোয় ধরে থাকলেও অন্যের কিছু হত না—আগে থেকেই তার হাতে অবশ্য 'প্রেতশক্তি' চালনা করে দিতেন মিঃ হোম।

আগুন নিয়ে, অঙ্গার নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করার পর স্যার ক্রুকস তাঁর হাত পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেছিলেন। চামড়ায় ছ্যাঁকা তো লাগেইনি—বরং তা মেয়েদের হাতের মতই কোমল পেলব রয়েছে!

আগুনে মাথা ঢুকিয়ে যাঁর চুল পর্যন্ত পোড়ে না, এমন লোক কি শক্তি বিদ্রোহী পেতাত্মার কাছ থেকে, আজও তা জানা যায় নি।

এ তো গেল অশরীরী শক্তি, কিন্তু শরীরী শক্তির ঘটনাও তো কম নয়। নাহান কোকার নামে একজন কামার ছিল মেরীল্যাণ্ডে। ছেলেবেলায় ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে ফুটন্ত ঝোল, ফুটন্ত কফি খেত। একটুও অসুবিধে হত না। বড় হয়ে সে ধরল কামারের ব্যবসা। গরম লোহা চিমটেতে না ধরে আঙুলে করে তুলত —আঙুলে ছ্যাঁকা লাগত না। আগুনে তাতানো কোদাল জিভ দিয়ে চাটতো। জিভ পুড়তো না। তরল সিসে মুখের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করত জমে শক্ত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। ডাক্তার পরীক্ষকদের সামনেই সে এই সব অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়েছে এবং তা নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড কাগজের 7 সেপ্টেম্বর 1871 সংখ্যায় ছাপাও হয়েছে।

আগুন-হাঁটিয়েদের অনেকেই দেখেছে এই ভারতে। একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলা যাক। 1921 সালে মহীশূর মহারাজার সামনে একজন মুসলমান শ'চারেক মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বিরাট আগুনের কুণ্ডর ওপর দিয়ে একে-একে হাঁটায়। সে নিজে দাঁড়িয়েছিল কুণ্ডের পাশে। সবশেষে কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে এবং জলপান করে যায় আকণ্ঠ। আগুনের জ্বালা নিজের শরীরে নিয়েই নাকি এত লোককে জ্বলুনি থেকে সে বাঁচিয়েছে।

মহীশূরের রোম্যান ক্যাথোলিক বিশপ এ প্রসঙ্গে লিখে-ছিলেন—ভগবান নয়, মনে হয় কোন প্রেত শক্তি ভর করে ওকে।

অবিশ্বাস্য এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন মাইশোর কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল স্বয়ং।

তিব্বতী যোগীরা শরীর গরম করতে জানেন

বাইরের আগুনের আঁচ শরীর যেমন তোয়াক্কা করে না, তেমনি শরীর ইচ্ছে করলে শরীরের আঁচও বাড়িয়ে নিতে পারে। এ ক্ষমতার অধিকারী তিব্বতের যোগীরা। নিরাবরণ দেহে তাঁরা ঘোরাফেরা করেন দারুণ ঠাণ্ডায়। তিব্বতী ভাষায় 'তিউমো' মানে কিন্তু উষ্ণতা বা আগুন নয়। 'তিউমো' শব্দটা আছে অতীন্দ্রিয়বাদে। তিব্বতী যোগীরা এই 'তিউমো' উৎপাদন করে নেয় শরীরের মধ্যে ধ্যানের মাধ্যমে—শরীর এত গরম হয়ে যায় যে ঠাণ্ডায় আর কাবু হন না।।

1981 সালে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এই রহস্য ভেদ করার জন্যে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডক্টর হার্বার্ট বেনসনের নেতৃত্বে আসেন ভারতে দালাই লামার আমন্ত্রণে, তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সাহায্য করেন এঁদের। ধ্যানে বসে তিনজনেই হাতের আর পায়ের আঙুলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ফেলেন 15 ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত। অন্যান্য চামড়ার অঞ্চলে তাপমাত্রা অত বাড়েনি—শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক।

কি করে তা হয়? ডক্টর বেনসনের বিশ্বাস, ধ্যান করে যোগীরা চামড়ার ছোট ছোট রক্তবহা নালীগুলোকে স্ফীত করে নিতে পারেন বলেই এই সব জায়গা বেশি গরম হয়ে যায়। ব্যাপারটা বিস্ময়কর এই কারণে! যে ঠাণ্ডার জায়গায়, বিশেষ করে তিব্বতে, আঙুলের ডগার রক্তবহা নালীকে কুঁচকে রাখাই তো শরীরের ধর্ম।

মহাসমুদ্রে মরুদ্যান

1881 সালের ঘটনা। ক্যাপ্টেন নীলকারি লিভারপুল থেকে সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছিলেন 'লারা' জাহাজে। সঙ্গে স্ত্রী আর দুই সন্তান। মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূল থেকে হাজার দেড়েক মাইল দূরে আগুন লাগল জাহাজে। তিনটে লাইফবোটে 32 জন খালাসী আর ফ্যামিলি নিয়ে জলে ভাসলেন ক্যাপ্টেন।

অচিরেই শুরু হল তৃষ্ণার যন্ত্রণা। ধু-ধু প্রশান্ত মহাসাগরে দিশেহারা হলেন ক্যাপ্টেন —কোন দিকে মেক্সিকোর উপকূল, তা গুলিয়ে ফেললেন। একে-একে জ্ঞান হারালো সাতজন নাবিক।

সকলেই তখন ধুঁকছে। স্বপ্ন দেখছে মিষ্টি জলের। লাইফবোটের তলার নীল জল সবুজ হয়ে যাচ্ছে?

মাথা ঝাঁকিয়ে এক পাত্র জল তুলে নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন! কী আশ্চর্য! জল তো নোনা নয়—সুপেয়!

আর তখনই পরিবর্তনটা নজরে এল ক্যাপ্টেনের। লাইফবোট তিনটে সবুজ জলের অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে—সমুদ্রের নীল জলের মাঝে সবুজ জলকে সবুজ মাঠের মতই মনে হচ্ছে। রহস্যজনকভ বে মিষ্টি জল উঠে আসছে সাগর-তল থেকে—অনন্ত সাগরে প্রাণ বাঁচানোর মরুদ্যান!

জাহাজডুবির তেইশ দিন পরে সবাইকে নিয়ে নির্বিঘ্নে ডাঙায় নেমেছিলেন ক্যাপ্টেন।

পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েও কে মরে না?

রাসপুটিন! পাগলা সন্ন্যাসী রাসপুটিন! রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে যে আগলে রেখে দিয়েছিলেন নিজের সম্মোহনী ক্ষমতা আর রোগ সারানোর অলৌকিক শক্তি দিয়ে। অত্যন্ত নোংরা স্বভাবের অতিশয় রুক্ষ প্রকৃতির এই উন্মাদ সন্ন্যাসীকে ভয় করত সম্ভ্রান্ত পুরুষরা। পথের কাঁটা সরানোর জন্যে 1916 সালের 29 ডিসেম্বর তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় খানাপিনার আসরে। খাবারে মেশানো ছিল কালান্তক বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড। রাসপুটিন তা

খেয়েও মরেনি। তখন তাকে গুলি করা হয় পেছন থেকে। অনেকক্ষণ পরে বেঁচে ওঠে মৃতদেহ। আবার তাকে গুলি করা হয় পর পর দুবার। নদীর বরফে গর্ত খুঁড়ে ভয়াবহ এই সন্ন্যাসীকে যখন পুঁতে ফেলা হচ্ছে, তখনও দেখা যায় শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে রাসপুটিনের দেহে!

জলে ভাসে সোলার মত

1931 সালের 13 আগস্ট নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন-য়ে অ্যাঞ্জিলো ফাটিকোনির মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয় এই শিরোনামায়।

'মানুষ ছিপি' পরলোকে : রহস্য অপ্রকাশিত রয়ে গেল!

অস্বাভাবিকভাবে ভাসমান থাকবার ক্ষমতা ছিল ফাটিকোনির। হাটুতে বিশ পাউণ্ড সিসের ওজন বেঁধে পনেরো ঘণ্টা ভেসে থাকত অনায়াসে। ওজন দিয়ে ভারি করা চেয়ারে বাঁধা অবস্থাতেও অবলীলাক্রমে ভাসত জলে। ডাক্তাররা মাথা চুলকেছেন—কারণটা ধরতে পারেন নি। ফাটিকোনি নিজে অবশ্য বলেছিল, গুপ্তরহস্যটা সবাইকে জানাবে—কিন্তু শেষপর্যন্ত আর জানায় নি।

প্রার্থনায় কিনা হয়!

1974 সালে নিউহ্যাভেনের জো রিকার বেঁকে বসলেন। ক্যানসারে তাঁর খুলি ফুটো হয়ে গেছে, মগজ দেখা যাচ্ছে—তবুও অপারেশন করতে দেবেন না।

একমাস পরে ডাক্তারের সামনে মাথা নামিয়ে তিনি দেখালেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি ডাক্তার।

খুলির ফুটো ঢেকে গেছে নতুন চামড়ায়!

কিভাবে? খুব সোজা পথে। জো রিকোর স্ত্রীর বোন ফ্রান্সের Lourdes কুণ্ড থেকে এক বোতল জল এনে দিয়েছে। ভক্তিভরে সেই জল দিয়ে রোজ মাথা ধুয়েছেন জোরিকো।

এক মাসেই গজিয়েছে নতুন চামড়া!

অলৌকিক ডাক্তার আরিগো

অকাল্ট মেডিসিনের ইতিহাসে সবচেয়ে রহস্যময় নাম এই আরিগো—ব্রেজিলে যার জন্ম চাষীর ঘরে (1918)। আরিগোর স্থানীয় অর্থ 'অসভ্য গেঁইয়া'।

স্কুলে পড়বার সময়ে প্রায় চোখ ধাঁধানো আলো দেখতে পেত আরিগো। শুনতে পেত অদ্ভুত ভাষায় কে যেন কথা বলছে তার সঙ্গে। এই আলো আর কেউ দেখতে পেত না—অদ্ভুত ভাষাও কারও কানে ঢুকত না। এটা গেল কৈশোরের কষ্ট।

বড় হয়ে চাকরি করতে ঢুকে কষ্ট আরও বাড়ল। রাতে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হত। স্বপ্নে দেখত একটা অপারেশন

টাক মাথা, হেড়ে কণ্ঠস্বর...

ঘর। টাক মাথা হেঁড়ে কণ্ঠস্বর। কৈশোরে ঠিক এই কণ্ঠস্বরই তার সঙ্গে কথা বলে গেছে।

কষ্ট সইতে না পেরে আরিগো গেল গির্জাতে প্রার্থনা করতে।

স্বপ্নের ডাক্তার তখন দিলেন নিজের পরিচয়। নাম তাঁর ডাক্তার অ্যাডোলফো ফ্রিজ। মারা গেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। অনেক কাজ বাকি। তাই বেছে নিয়েছেন আরিগোকে। রুগী আর দুর্গতদের সেবা করে গেলে আরিগো আর কষ্ট পাবে না।

বছর কয়েক অব্যাহত রইল দুঃস্বপ্ন আর মাথার যন্ত্রণা। 1950 সালে পরিস্থিতি আরিগোর আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে দেখা হল রাজনীতিবিদ লুসিয়া বিটেনকোর্টের। পাশের এক শহরের হোটেলে উঠেছে দুজনেই।

আরিগো জানত না। বিটেনফোর্টের ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, এক্ষুনি আমেরিকায় গিয়ে যেন অপারেশন করিয়ে নেন।

রাত হয়েছে। বিটেনকোর্ট ঘুমোতে যাবেন। এমন সময়ে খুলে গেল তাঁর ঘরের দরজা। কে যেন আলো জ্বালল। সুইচ টিপে। আরিগোর কাজ। হাতে তার খোলা ক্ষুর। দুই চোখ আবিষ্ট। আশ্চর্য এই যে, বিটেনফোর্ট ভয় পেলেন না। ভারি জার্মান উচ্চারনে কথা বলে গেল আবেগে—যে গলায় সে কখনও কথা বলে না। বললে, এমার্জেন্সি অপারেশন করতে হবে। বিটেনফোর্ট অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন, পাজামা জ্যাকেটে ক্ষুর দিয়ে চেরা হয়েছে। রক্তে তা মাখামাখি। পিঠের পাঁজরের খাঁচায় একটা পরিষ্কার চেরা দাগ। জামাকাপড় পরে নিয়ে গেলেন আরিগোর ঘরে।

আরিগো ভাবল, মদ খেয়ে ভুল বকছে বিটেনফোর্ট। কিন্তু বিটেনকোর্টের ঘরে গিয়ে যখন দেখল। পাজামা জ্যাকেটে ক্ষুর চলেছে, রক্তে মাখামাখি হয়েছে, তখন বুঝল অপারেশন জাতীয় কিছু একটা হয়েছে বটে। কিন্তু তার নিজের তো কিছু মনে নেই। কাজেই অস্বীকার করল সব কিছুই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পরের প্লেন ধরেই রিও ডি জ্যানিরো তে গেলেন নিজের ডাক্তারকে গিয়ে পিঠের অপারেশন দেখানোর জন্যে।

ভয় পেয়েছে কিন্তু আরিগো নিজেও। ঘোরের মাথায় এ কাজ নিশ্চয় সে নিজেই করেছে। স্বপ্নে এই রকম নির্দেশই তো এসেছে তার কাছে এত বছর ধরে।

খবরটা এর পরেই আগুনের মত ছড়িয়ে গেল সারা ব্রেজিলে। বিটেনকোর্টের এক্স-রে ছবি তুলে অবাক হয়ে গেছেন তাঁর ডাক্তার। আশ্চর্য অপারেশন হয়েছে বটে—এরকম অপারেশন পদ্ধতি ব্রেজিলের কোন ডাক্তারের মগজে নেই। টিউমার কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিটেনকোর্ট বেঁচে যাবেন।

খবরের কাগজে পড়ে শঙ্কিত হলেন আরিগোর পুরুৎ ঠাকুর। খবরদার! এ কর্ম যেন আর করা না হয়। পড়ল মহা ফাঁপরে। সে করবে কী? যে কাজ সে সজ্ঞানে করেনি। করার পরেও কিছু মনে করতে পারছে না—তার ওপর তার ওপর তার হাত কতটুকু?

লোকের ভিড় এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। আরিগোর অলৌকিক চিকিৎসা তাদের দরকার। এদিজে ডক্টর ফ্রিজও সমানে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন—জার্মান বুকনি ছাড়ছেন।

পরের ছ'বছরের প্রতিদিন রোজ 300 রুগী দেখেছে আরিগো। নিজের বাড়িতে এত লোককে জায়গা দিতে না পেরে একটা খালি গির্জেতে বানিয়েছে ডাক্তারখানা। 1956 সালে উঁচু মহল থেকে অভিযোগ এল তার নামে—'বেআইনী ডাক্তারী' করা চলবে না। ডাক্তার মহল উঠে পড়ে লাগল আরিগোর পেছনে।

বিচারকের প্রথম প্রশ্নটা হয়েছিল এই ভাবে—"ডাক্তারী করো কিভাবে?" সরল জবাব দিয়েছিল আরিগো—আগে ভগবানকে ডাকি। তারপর আর কিছুই দেখিনা, শুনিনা, জানিনা। লোকে বলে, আমি প্রেসক্রিপশন লিখি। আমার মনে পড়ে না।"

"অপারেশনগুলো হয় কিভাবে?

"একই ভাবে। মনে করতে পারি না। গরীবকে সাহায্য করতে চাই—আর কিছু না।"

"সেটা তো বেআইনী।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি তো নিমিত্ত। ডাক্তার ফ্রিজ আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। আমি নিজে করছি না।"

বিচারপতির মনে দাগ কাটল না আরিগোর কথাগুলো। ডাক্তার ফ্রিজই যদি অপারেশন করে যান, আরিগো তাঁকে আদালতে আনতে পারবে?

কাগজে কাগছে কিন্তু তখন আরিগোর স্বপক্ষে ঢক্কা-নিনাদ শুরু হয়ে গেছে। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ এবং আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আরিগোর কীর্তি স্বচক্ষে দেখেছেন। বুজরুকি নিশ্চয় নয়।

তা সত্ত্বেও আরিগোকে শাস্তি দিলেন বিচারপতি। জেল এবং জরিমানা। প্র্যাকটিসও বন্ধ রাখতে হবে।

প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে গিয়ে ফের মাথার যন্ত্রণা ফিরে এল। পুলিশ তখন তার পক্ষে। দেখেও দেখত না তার কীর্তিকলাপ। তাই লুকিয়ে চুকিয়ে ডাক্তারী শুরু করে আরিগো। 1958তে প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করে তাকে।

কিন্তু 1961 তে চেয়ার থেকে বিশেষ এই প্রেসিডেন্ট সরে যেতেই আবার চাপ সৃষ্টি হতে থাকে আরিগোর ওপর আইনের প্যাঁচে তাকে নাজেহাল করার চেষ্টা যখন চলছে পুরোদমে, ঠিক সেই সময়ে ঘটনা স্রোত মোড় নিল অন্য দিকে। আমেরিকার সুবিখ্যাত অলৌকিক তদন্তকারী ডাক্তার আনদ্রিজা পুহারিখ দেখা করতে এলেন তার সঙ্গে।

তিনজন সঙ্গী সমেত বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে নিজের কীর্তি দেখাতে রাজী হল আরিগো। প্রথম দিনেই 200 লোক হাজির তার ডাক্তারখানায়। তখন সকাল সাতটা। সবাইকে দিয়ে আগে প্রার্থনা করিয়ে নিল আরিগো। কার কি ধর্ম, তাতে বয়ে গেল, সব ধর্মই সমান। আরিগোর বিশ্বাস তাই। প্রার্থনা শেষ করে ঢুকল একটা খুপরি ঘরে। সেকেন্ড কয়েক পরেই বেরিয়ে এল অন্য মূর্তি নিয়ে। তার উদ্ধত আচরণ, চড়া গলায় কাটা-কাটা জার্মান বুকনি হতচকিত করে দিল ডাক্তার পুহারিখকে। এ কে?

ঝড়ের মত অপারেশনের পর অপারেশন চালিয়ে পুহারিখের চক্ষুস্থির করে দিল আরিগো এর পরেই। একজন প্রৌঢ়কে হেলায় দেওয়ালে চেপে ধরে একটা চার ইঞ্চি লম্বা ছুরি নিয়ে ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিলে তার বাঁচোখের গোলক আর পাতার ফাঁকে, বের করে এনে ছুরির ডগার পুঁজ মুছে নিলে নিজের জামায়। যার চোখে এত জোরে ছুরি ঢোকানো হল, সে কিন্তু নির্বিকার। ব্যথা লাগেনি একদম। এক মিনিটেই অপারেশন শেষ। রক্তপাত

ঘটেনি -পুহারিখ নিজে পরীক্ষা করলেন। আরিগো হেঁড়ে গলায় বিদেয় করল এই রুগীকে - ভাল হয়ে যাবে—আর ভয় নেই।

এই ভাবেই চলল সারা সকাল। অ্যান্টিসেপ্টিক বা অ্যানেস্থেসিয়া দ্রব্যের ধার ধারল না আরিগো। সম্মোহন পর্যন্ত করছে না। রক্তপাত ঘটছে যৎ সামান্য। রুগীদের কোন ব্যথা লাগছে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে প্রেসক্রিপশন লিখছে আরিগো। বিনা দ্বিধায়। 11 টায় শেষ হল ডাক্তারী। এখন যাবে সরকারী চাকরিতে। ফিরে আসবে বিকেলে।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে আসতেই মিলিয়ে গেল তার উদ্ধত আচরণ আর জার্মান বুকনি। আবার সেই বিনম্র, মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া আরিগো—অসভ্য গেঁইয়া !

চাকরি করেই পেট চালিয়েছে সে—চিকিৎসাবাবদ কানাকড়িও নেয়নি কারও কাছ থেকে।

বিকেলে ডাক্তারখানায় মুভীক্যামেরা লুকিয়ে রাখলেন পুহারিখ নিজের এক সঙ্গীর হেপাজতে। আরিগো হাতসাফাই করে কিনা—ক্যামেরায় তা ধরা পড়বেই। রাত একটা পর্যন্ত চলল আরিগোর চিকিৎসা। দু-শ রুগী সুস্থ হয়ে গেল বিণা যন্ত্রণায়।

দেখেশুনে মাথা ঘুরে গেল পুহারিখের।

পরের দিন নিজের ডান কনুই বাড়িয়ে দিলেন আরিগোর সামনে। একটা নির্দোষ টিউমার ছিল সেখানে। পুহারিখকে অন্য দিকে মুখ ফেরাতে বলে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আধইঞ্চির মত টিউমারটা বের করে এনে ফেলল আরিগো। পুহারিখ কোন ব্যথা পায় নি। পরে কাটা জায়গা আপনি জুড়ে গেছে—সেলাইও করতে হয়নি। বা পচে যায় নি—অ্যান্টিসেপ্টিক না লাগানো সত্ত্বেও।

মুভী ক্যামেরা ধরে রেখেছে এই অপারেশন দৃশ্য।

আবার হৈ-চৈ শুরু হল কাগজে কাগজে। আবার টনকনড়ল কর্তৃপক্ষের। আবার বিচার হল তার। কারাদণ্ড দেওয়া হল 16 মাসের।

কিন্তু পুলিশ এল না তাকে জেলখানায় নিয়ে যেতে। তারা আসবে না। বিরক্ত হয়ে আরিগো নিজেই গেল জেলে থাকতে।

জেলখানাতেও চলেছে তার চিকিৎসা। পুলিশ মুখ ফিরিয়ে থেকেছে অন্যদিকে।

1965র নভেম্বরে জেল থেকে আরিগো বেরোতেই আবার পুহারিখ এলেন বিশেষজ্ঞ সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। আরিগোকে বলতেই হবে—কি ভাবে করে সে এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানা !

"খুবই সহজে" জবাব দিলে আরিগো—আমি তো শুধু ডাক্তার ফ্রিজের হুকুম তামিল করে যাই। উনি বরাবর হুকুম দেন আমার বাঁ কানে।

ব্রেজিলের মেডিক্যাল সোসাইটি মহাখাপ্পা হয়ে উঠলেও পুজারিখ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে যাচাই করলেন আরিগোকে। রিপোর্টারদের ভিড়ে বিরক্ত হয়ে শেষে ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। বিশেষজ্ঞদের সামনে দেখালেন আরিগোর অপারেশনের রঙিন ছবি: সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন অপারেশনের সময়ে আরিগোর মুখভাব একেবারে নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে, হাত চলছে অবিশ্বাস্য স্পীডে এবং দক্ষতায় (অন্য দিকে তাকানোর সময়েও) কাটা ছেঁড়া ক্ষত যেন 'আঠা লাগানোর মত জুড়ে যাচ্ছে আপনা থেকে (সেলাই না করেও)। আরিগো শল্যচিকিৎসার অ-আ-ক-খ জানে না। অথচ একী কাণ্ড করছে সে ? মাথা ঘুরে গেল বাঘাবাঘা বিশেষজ্ঞদের।

আরিগো কি ম্যাজিশিয়ান ?

সকলেরই ভাবনার বিষয় নিচের ঘটনাগুলো ঃ

1) সন্দেহাতীতভাবে অসংখ্য লোককে সে সারিয়ে দিয়েছে।

2) সত্যিই কাটা ছেঁড়া সে করেছে। সবই জুড়ে গেছে বেমালুম। অথচ ছুরি কাঁচি চলেছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পন্থায়।

3) চেতনানাশক কেমিক্যাল দেওয়া হয়নি—অথচ তার কোনো রুগীই এতটুকু ব্যথা অনুভব করেনি—অপারেশনের পরেও করেনি।

4) চক্ষের নিমেষে রোগ বুঝে নিতে পারত আরিগো — নিখুঁত প্রেসক্রিপশন লিখত চিকিৎসা বিজ্ঞানে গোমুর্খ হয়েও।

5) চিকিৎসা করে কানাকড়ি সে নেয়নি। পেট চালিয়েছে সামান্য চাকরি করে।

1971 সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় আরিগো। 1975 সালে মার্চমাসে ভূগোলকের সবাই জেনে যায় তার কীর্তি কাহিনী 'রীডার্স' ডাইজেস্টের একটি লেখায়।

বিচিত্র সংবাদ

বরুণ কুমার দাস

বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কার্পেট

বিশ্বের সবচেয়ে দামী পারসিয়ান কার্পেটটি বর্তমানে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'আরহদাবিল কার্পেট'। সাড়ে চৌত্রিশ ফুট লম্বা ও সাড়ে সতেরো ফুট চওড়া এই কার্পেটটি বুনতে সময় লেগেছিল 30 বছর (1509-1539)। এতে প্রত্যেকটি গিট হাতে দেওয়া এবং গিটের সংখ্যা তিন কোটি তিরিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার দু'শোটি। কার্পেট বিশেষজ্ঞরা এর মূল্য নির্ধারণ করেছেন দশ লক্ষ মার্কিন ডলার।

মাউন্ট ওয়াশিংটন

জর্জ ওয়াশিংটনের নামানুসারে আমেরিকায় অবস্থিত 6288 ফুট উঁচু এই চূড়াটির নাম 'মাউন্ট ওয়াশিংটন'। 1642 সালে সর্বপ্রথম মানুষ এই শৃঙ্গে আরোহন করে। পৃথিবীতে এটাই একমাত্র শৃঙ্গ যাতে একটি পাকা রাস্তা রেলওয়ে স্টেশন, একটি হোটেল, টেলিগ্রাফ অফিস, একটি দৈনিক পত্রিকা অফিস, টেলিফোন সার্ভিস আবহাওয়া অফিস সহ একটি রেডিও এবং একটি টেলিভিশন স্টেশন আছে।

মুখে নয় লেজে শ্বাসযন্ত্র

'মাডকিপার' নামে এক প্রকার মাছ আছে যেগুলো বেশীরভাগ সময়ই ডাঙ্গাতেই কাটালেও বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে পারে না। এদের পুরো শরীরটা ডাঙ্গাতে থাকলেও লেজটা থাকে জলে নিমজ্জিত। কারণ, এদের লেজেই শ্বাস গ্রহণের যন্ত্র আছে। যেটা জলে থেকে অন্যান্য মাছের মত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে।

সাতরঙা বালুকা

ভারতের ত্রিবাঙকুরের সমুদ্র উপকূলের বালুর রঙ হয় সাত ধরণের—লাল, কমলা, রূপালী, বাদামী, হলুদ, নীল ও লালচে-বাদাসী। এই উপকূল হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান।

হিন্দুধর্মীয় 'পুরাণ' সতানুসারে এখানে শিবকুমারীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন বিবাহ-রীতি অনুযায়ী স্বর্গের দেবতারা তখন ঐস্থানে সাত রকমের ধান বর্ষণ করেছিলেন। বলা হয় ঐ সাতরঙা ধান বালুতে মিশে এখানকার বালুকে স্থায়ীভাবে সাতরঙা করে দেয়।

আশ্চর্য্য বটে

রাশিয়ার পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালায় একটা বিশালাকার মহিষের মাথার খুলি সংগৃহীত আছে। খুলিটার সামনের দিকে একটা গোল ফুটো আছে, যেটা দেখে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেছেন, আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের আঘাতে এই ফুটো হয়েছে এবং কার্বনটেস্টে জানা গেছে খুলিটা কয়েক হাজার বছর আগের।

লণ্ডনের প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘরে একটা মানুষের মাথার খুলি সংরক্ষিত আছে। উত্তর রোডেশিয়ার এক গুহা থেকে উদ্ধারকৃত এই খুলিটীর বাঁ পার্শ্বে নিখুঁত একটা গোল ফুটো আছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেছেন খুলিটা 80,000 বছর আগেকার একজন গুহা মানবের এবং গুলির আঘাতে এ ফুটোটা হয়েছে। চল্লিশ হাজার বছর আগেকার গুহামানবের হাতে বন্ধুক এটা ভাবতে যেমন অবাক লাগে তেমনি আশ্চর্যও বটে।

অজানা প্রাণীর সন্ধান

কিছুদিন আগে নাম না-জানা একটা প্রাণীর কংকালের সন্ধান পাওয়া গেছে যা বর্তমানে আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ড (Spring field University) প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা ওটার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রাপ্ত এই প্রাণীর কংকাল থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, প্রাণীটার হাতির মত লম্বা মধ্য শরীরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি শূকর শাবকের ন্যায় মাথা ছিল। এর উচ্চতা ছিল একটি ভল্লুকের সমান এবং ওজন ছিল প্রায় 135 কিলোগ্রাম। এই অবলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীটি পৃথিবীতে প্রায় হাজার বছর বিরাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

CASIO কোম্পানীর নতুন ঘড়ি

জাপানের বিখ্যাত ইলেকট্রনিকস্ কোম্পানী CASIO এবার নতুন মডেলের তরলীকৃত ক্রিস্টাল দিয়ে একটি ঘড়ি তৈরী করার জন্য স্থান নির্ধারণ করেছেন। নতুন এই মডেলটির সাথে একটা টেলিফোন গাইড সংযুক্ত থাকবে এবং এর স্মৃতিতে পঞ্চাশটিরও বেশী টেলিফোন নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। একটি মাত্র বোতাম টিপে দিলেই পর্দায় ভেসে উঠবে আকাঙ্খিত নম্বরটি। এছাড়া সময় এবং এলার্ম তো থাকছেই।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক আবিষ্কার

আনুমানিক প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগে মানুষ সাইবেরিয়াস্থ Yakutta নামক স্থানে বাস করত। সোভিয়েট প্রত্নতত্ত্বিদ রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এই কথা প্রমাণ করেন। এ পর্যন্ত এটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, এই গ্রহের (পৃথিবী) প্রাথমিক যুগের প্রাচীন সভ্যতা ছিল পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত। এমনকি অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণেরাও একথা কল্পনা করতে পারেন না যে, মানুষ উত্তরাঞ্চলীয় দুঃসহ ও ক্লেশকর আবহাওয়াপূর্ণ অবস্থায় জীবনযাপন করতে সক্ষম।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা চিত্র

স্পেনের উত্তর-পূর্বীয় অঞ্চলের দু'টো গুহা থেকে সাম্প্রতিক একদল যুবক অভিযাত্রীদল প্রস্তরীভূত কিছু চিত্রকর্ম আবিষ্কার করেছেন।

Saragona গবেষণা কেন্দ্রের প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা ঐ চিত্রগুলো পরীক্ষা করে ব্যাখ্যা করেছেন যে ঐগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা এবং আজ থেকে প্রায় তিন-চার হাজার বছরের পুরানো চিত্রগুলো পরিকল্পনাবিহীন ভাবে আঁকা এবং কতগুলো ব্যস্ত নিরপেক্ষ বিমূর্ত চরিত্রের।

ছবিগুলো বহু সংখ্যক লাল ও কাল কিছু রেখা ও বিন্দুর সমন্বয়ে অংকিত, যা দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিশ্বাস করছেন যে, এই প্রস্তরীভূত চিত্রগুলো বিজ্ঞানের এক বিরাট বিস্ময় বহন করছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে এই রকম আরো কিছু প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকর্ম পেলে বিজ্ঞানের অনেক অজানার এবং রহস্যের সমাধান মিলবে।

সবচেয়ে উঁচু গাছের ঝাড়

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গাছের ঝোপ বা ঝাড়টি ইংল্যাণ্ডের গ্লাউসেস্টারশয়ারের সায়রেন-সেণ্টার পার্কে অবস্থিত। 30 ফুট উঁচু এই ঝোপ গাছটি এতই বিস্তৃত যে, বছরে একবার পাতা ছাঁটতে সময় লাগে দশ দিনের মত।

মূল্যবান হীরকখণ্ড

বিশ্বের অন্যতম ধনী ছিলেন এককালে ভারতের হায়দ্রাবাদের নিজাম। তাঁর কাছে 182·5 ক্যারেট ওজনের একখানি মূল্যবান হীরকখণ্ড ছিল। এর মূল্য ছিল প্রায় দশ কোটি টাকা। তিনি এটিকে পেপারওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতেন। 1905 সালের দিকে এই হীরকখণ্ডটি হারিয়ে যায় এবং দীর্ঘ 6 বছর পর 1911তে আবার তাঁর মৃত্যুর পর পাদুকার মধ্যে হীরাটি পাওয়া যায়।

মেক্সিকোতে প্রস্তরীভূত চিত্রাদির সন্ধান

আমাদের অতীত পূর্বপুরুষ কর্তৃক অঙ্কিত প্রায় চল্লিশটি প্রস্তরীভূত চিত্র সাম্প্রতিককালে আধুনিক মানুষ দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। মেক্সিকান প্রদেশের Tlaxcala নামক একটি গুহা থেকে এগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। কালো এবং লালরঙের সমন্বয়ে তারা চিত্রিত করেছে বিভিন্ন অদ্ভুদ প্রাণীর, শিকারের দৃশ্যাদি এবং অতীত দিনে তাদের প্রাত্যাহিক জীবনের।

আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এবং ঐতিহাসিক যাদুঘর কর্তারা বিশ্বাস করেন যে, ঐ চিত্রগুলো খ্রীষ্টপূর্ব তিন বা দুই সহস্র বছর আগে চিত্রিত হয়েছে। যখন ঐ অঞ্চলের প্রথম যাযাবর উপজাতি Plateau, কোন ভূমিচাষের ব্যবস্থা জানত না এবং বন্যপ্রাণী শিকারের মাধ্যমে খাদ্যসংগ্রহ করত, সেই যুগের গুহামানবদেরই কীর্তি এগুলো। অবশ্য এই চিত্রকর্ম Tlaxcalaতে এই প্রথম নয়। গত বছর এ রকম আরো দুটো গুহা প্রাচীর এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোতে ঐ রকম সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্যপূর্ণ চিত্রাদির সন্ধান পাওয়া গেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর

অব্যক্ত

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ।। দাম ২০·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ভুতুড়ে বাঁক

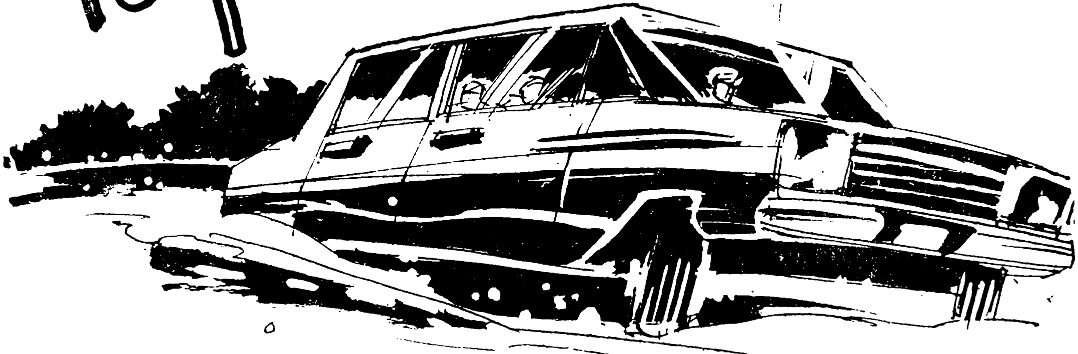

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

চিনতে পারছেন স্যার ?

রায়পুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই হাসি মুখে এগিয়ে এলেন এক যুবক। পরনে পুলিসী পোষাক, মনে হয় বেশ উচ্চপদস্থ অফিসার।

সূর্য দাদু একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে হাসলেন—মুখটা তো খুবই চেনা! কোন্ ব্যাচের বলতো ?...নামটা ঠিক....

আমি রঞ্জিত স্যার! রঞ্জিত মিত্র! এম. এস-সিতে আপনার ছাত্র ছিলাম—যুবক হেসে জবাব দিলেন।

বলো কি ? ভূতপূর্ব ভূতত্ত্ববিদ এখন পুলিস !—হাঁটতে হাঁটতে ও'র পিঠ চাপড়ে দিলেন সূর্য দাদু।

শুধু পুলিস নয় স্যার!—রঞ্জিত বাবু হেসে বললেন, ভূতত্ত্ব থেকে একেবারে ভূত-তত্ত্বে বলতে পারেন।

বলো কি! সূর্য দাদু অবাক হয়ে তাকালেন। শুনতে আগ্রহ হচ্ছে। ব্যাপারটা কি ?

আমরা ততক্ষণে বাইরে এসে গেছি। একটা জীপ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। জীপের দরজাটা খুলে ধ'রে রঞ্জিত বাবু বললেন, বলব স্যার! বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। খাওয়া দাওয়া করুন। তারপর। নিন, উঠুন স্যার।

গাড়ীতেই রঞ্জিত মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল সে আমারই সমবয়সী, কাজেই আপনি থেকে অনায়াসেই তুমিতে চলে এলাম। চমৎকার, অমায়িক ছেলে। আর খুব আমুদেও মনে হ'ল।

সে হেসে বলল, তুমি কিন্তু সত্যিই ভাগ্যবান কুন্টু। এমন একজন বিজ্ঞানীর সহকারী হিসাবে সব সময় কাজ করা...তা গবেষণা করছ নাকি ?

সূর্য দাদু বললেন, হ্যাঁ। আমার কাছেই কাজ করছে।

বাঃ! রঞ্জিত উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, দাদু, জিওলজিস্ট গাইড!

সূর্য দাদু মুচকে হাসলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর বাংলোর বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। পশ্চিমের বারান্দাটা ভ'রে আছে শীত দুপুরের মিঠে রোদ্দুরে। গায়ের শালটা ভাল ক'রে জড়িয়ে সূর্য দাদু বললেন, তা বাবা রঞ্জিত। ইউনিভার্সিটিতে আমার বক্তৃতা তো পরশু। ও'রা লিখেছিলেন ও'দের গেস্ট

হাউসেই থাকার ব্যবস্থা করবেন। তা তুমি যে ভাবে গ্রেপ্তার ক'রে আনলে···

না স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওদের বলে দিয়েছি যে আপনি আমার এখানেই থাকবেন।

তা বেশ। খুব ভাল কথা!—সূর্য দাদু যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন এবাব তাহ'লে তোমার সেই ভূত তত্ত্বের ব্যাপারটা একটু খুলে বল দেখি। ঘটনাটা কি?

ওঃ!—একটু হেসে রঞ্জিত বলল—ওই ব্যাপারটা। আসলে ওটা যে সত্যি সত্যিই ভূতুড়ে ব্যাপার তা বলছি না। লোকে অবশ্য তাই বিশ্বাস করে। কিন্তু ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং তাতে সন্দেহ নেই। মানে এটাও স্বীকার করছি যে ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেও মাথা মুণ্ডু আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওকে আশ্বস্ত ক'রে বললাম, আচ্ছা, তুমি বলোই না ঘটনাটা! তারপর ভাবা যাবে।

ও শুরু করল।

ব্যাপারটার সূচনা ঠিক করে তা বলা কঠিন, তবে এটা প্রথম রিপোর্টেড হয় গত বছর শীতের শেষের দিকে। রায়পুর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে তেতাল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কে একটা মোটর একসিডেন্ট হয়। রাত্রি বারোটা নাগাত বোধহয় একসিডেন্ট হয়েছিল। একটা ট্রাক জগদলপুরের দিক থেকে আসছিল। তারপর হঠাৎ ওই জায়গাটাতে এসেই গাড়ীটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে যায়।

ঘটনাটা এমন কিছু নয়। এরকম দুর্ঘটনা তো কতই ঘটছে। কিন্তু ঐ ট্রাকের ড্রাইভার খুব গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে যে কথাগুলো বলেছিল সেটা বড় অদ্ভুত। সে বার বার বলেছিল যে, এই দুর্ঘটনার জন্য তার কোনো দোষ নেই। একটা ভূতের গাড়ী উল্টো দিক থেকে এসে ওর গাড়ীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

মাতালের প্রলাপ ভেবে তার কথাগুলোকে অবশ্য তেমন আমল দেওয়া হয়নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমল না দিয়ে আর পারা গেল না, কারণ তার ঠিক পর পরই একই রকমের আরো দু'টো দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিছু দিন এ নিয়ে একটু জল ঘোলা হয়ে আবার সব কিছু থিতিয়ে গেল। তারপর প্রায় দশ মাস পরে এবছর 10ই ডিসেম্বর আবার একটা গাড়ী উল্টে গেল ঐ একই জায়গায়। জায়গাটাতে আমরা দুটো বাম্প বসিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপরই যেন মোটর দুর্ঘটনার মিছিল লেগে গেল। এ পর্যন্ত এগারোটা গাড়ী ওখানে এ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তার মধ্যে ন'জন ড্রাইভারই মারা গেছে। শেষ দুর্ঘটনাটা ঘটেছে পরশু রাত্রে।

গাড়ীটা কার ছিল?—এতক্ষণে সূর্য দাদু কথা বলেন।

ওটা একটা প্রাইভেট গাড়ীই ছিল। লালজী নামে এ অঞ্চলের একজন নামী ডাক্তারের গাড়ী। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর জখম খুব সামান্যই। গাড়ীটা একটা গাছে ধাক্কা মেরেছে।

সূর্য দাদু ভুরু কুঁচকে বললেন ভূততত্ত্ব। স্ট্রেঞ্জ! কথা বলা যাবে লালজীর সঙ্গে?

কেন যাবে না! উনি আমার বিশেষ পরিচিত। আসতে বলব?

একটু ভেবে সূর্য দাদু বললেন—এখন একটু বিশ্রাম নেবো। সন্ধ্যার দিকে যদি উনি আসতে পারেন...

দেখি ফোন ক'রে।

রঞ্জিত ভেতরে চলে গেল। সূর্য দাদু বিড় বিড় ক'রে বললেন, অদ্ভুতুড়ে! কিম্ভূতুড়ে! না কি স্রেফ ভূতুড়ে? সেটাই এখন দেখতে হবে।

ডঃ বুস্তমের সঙ্গে আলাপ হ'ল সন্ধ্যার পরে। ডঃ বুস্তম অর্থাৎ লালজীর বয়স সূর্যদাদুর থেকে কিছু কম। এই বছর পঞ্চাশেক হবে। খুব স্মার্ট অথচ ভাল লোক। ওঁর কাছে ব্যাপারটা সম্পর্কে আরো ভাল ভাবে জানা গেল। ব্যাপারটা হ'ল এই—

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। শহরের বাইরে একটা কল সেরে ফিরছিলেন লালজী। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল এছাড়া আবহাওয়া ভালই ছিল। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা কাজেই একটু জোরেই চালাচ্ছিলেন তিনি। সামনেই রাস্তাটা অল্প একটু বাঁক নিয়েছে। তাই যদিও চোখেই দেখা যাচ্ছিল যে সামনে কোনো গাড়ী নেই তবু নিয়মমাফিক তিনি হর্ণ দিলেন। অমনি অবাক কাণ্ড, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুবহু একই রকম প্রত্যুত্তর শোনা গেল সামনে থেকে। অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে আরো একটা গাড়ী আসছে। কিন্তু তার আলো কই? হয়ত হেড লাইট খারাপ হয়েছে এই ভেবে গাড়ীর গতি একটু কমিয়ে আবার হর্ণ দিলেন তিনি। এবারও ঠিক একই রকম হর্ণের প্রত্যুত্তর। কিন্তু এবার খুব কাছে। বোধহয় পঞ্চাশ গজেরও কম দূরত্বে! কিন্তু তাহলে গাড়ীটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লেন লালজী এবং কিছু ভাবার আগেই অদৃশ্য গাড়ীটা এসে পড়ল ওঁর গাড়ীর ওপর। ব্যস্। আর কিছু মনে নেই।

সূর্য দাদু চিন্তিত ভাবে বললেন সেই অদৃশ্য গাড়ীটার কোনো চিহ্ন কিছু পাওয়া গেল?

রঞ্জিত মাথা নেড়ে বলল, না। তার কোনো সন্ধান বা সামান্যতম চিহ্নও নেই। আর সেটাই···

সূর্য দাদু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আজ রাত্রে ঐ জায়গাটায় একবার যাওয়া যাবে? রাজী আছ তোমরা?

আলবৎ ! বললেন লালজী। রঞ্জিতও এক কথায় রাজী।

সূর্য দাদু হেসে বললেন, লালজীও যাবেন ? বেশ চলুন। রাত্রি এগারোটায় কিন্তু রওয়ানা হব কেমন ?

রঞ্জিত নিজেই ড্রাইভ করছিল। কনকনে শীতের রাত। কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। শুধু গাড়ীর এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে লালজী চাপা গলায় বললেন ঐ সেই সেই বাঁকটা।

কুয়াশার চিহ্ন মাত্র নেই। সামনেই একশো গজ দূরে নজরে পড়ল রাস্তাটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে।

হর্ণ দাও—সূর্য দাদু শান্ত ভাবে রঞ্জিতকে বললেন।

রঞ্জিত সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিল স্টিয়ারিং হুইলের মধ্যিখানে। আমাদের গাড়ীর হর্ণের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ওদিক থেকে ঠিক হুবহু একই রকমের একটা হর্ণ শোনা গেল।

আসছে ! উত্তেজিত ভাবে সামনেই দিকে ঝুঁকে পড়লেন লালজী।

ভয় নেই ! ভয় নেই ! সূর্য দাদু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। হেড লাইটের তীব্র আলোয় যতদূর দেখা যায় -কোথাও কোনো গাড়ী নেই। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে জাতীয় সড়ক।

গাড়ীর গতি ততক্ষণে একটু কমিয়ে এনেছে রঞ্জিত। আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা গুর গুর শব্দ শুরু হয়ে গেছে। ভয় পেলেই এমন হয়—বরাবর লক্ষ্য করছি।

হর্ণ !

সূর্য দাদুর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার হর্ণ বাজাল রঞ্জিত এবং এবার প্রায় ততক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিল সামনের অদৃশ্য গাড়ীটি। দূরত্ব এখন বোধহয় পঁচিশ গজ। এবার ধাবমান গাড়ীটার এঞ্জিনের শব্দও শোনা গেল। পরক্ষণেই প্রায় আমাদের গাড়ীর ওপর এসে পড়ল সেটা।

থামাও !—তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে উঠলেন লালজী এবং প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল দুটো গাড়ী, যদিও অপর গাড়ীটিকে দেখা যাচ্ছিল না।

গাড়ী থেকে হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

ওঃ ! খুব বেঁচে গেছি।—হাঁফ ছাড়লেন লালজী।

সূর্য দাদু একটু হাসলেন। তারপরই স্তব্ধতা।

মাথার ওপর তারা ভরা আকাশ। চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। স্তব্ধ বাতাস। কোথায় গাড়ী !

তাজ্জব কী বাত ! —বলল রঞ্জিত।

ভৌতিক ব্যাপার ? — কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালজী।

হ্যাঁ, তা একরকম ভৌতিক ব্যাপার বৈকি। আসুন, দেখাচ্ছি। গাড়ীতে উঠুন।

সূর্য দাদুর নির্দেশে আমরা সবাই গাড়ীতে উঠতেই রঞ্জিত গাড়ী ঘুরিয়ে ফিরে চলল রায়পুরের দিকে। কিন্তু মাত্র দু'শো গজ যেতে না যেতেই সূর্য দাদু আবার হঠাৎ বললে —দাঁড়াও ! গাড়ীটা ব্রেক কষতেই তিনি বললেন, এঞ্জিন বন্ধ ক'রে একটা হর্ণ বাজাও তো।

হর্ণ বাজানোর পর আবার শোনা গেল সেই অদৃশ্য গাড়ীর হর্ণের শব্দ— অনেকটা দূরে।

এবার বুঝলে ?—সূর্য দাদু তাকালেন আমাদের মুখের দিকে। আমরাও তাকালাম ফ্যালফ্যাল ক'রে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত একটা। ড্রয়িং রুমের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সূর্য দাদু বললেন, একটু কফি পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। শীতে একেবারে…

কফি তৈরী হচ্ছে স্যার। আমি এসেই ব'লে দিয়েছি —রঞ্জিত বলল।

সূর্য দাদু মুচকি হেসে বললেন, সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কিছুই নয়। টোটাল ইণ্টারনাল রিফ্লেকশন বা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মূল কথাটা জানা থাকলে এটা সহজেই বোঝা যাবে। আলো যদি কাঁচের মধ্যে থেকে হাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করে, কিংবা জলের মধ্যে থেকে হাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করে তখন এই ধরনের প্রতিফলন হ'তে পারে। একটা বিশেষ কোণের থেকেও আলোক রশ্মি যদি বেশী হেলে পড়ে, তাহ'লে দুটি মাধ্যমর সংযোগ স্থল ভেদ ক'রে সে আর যেতে পারে না পুরোটাই প্রতি ফলিত হয় ঠিক আয়নার মত। এই অদৃশ্য মোটরের ব্যাপারটাও অনেকটা ওই রকমই, তবে এক্ষেত্রে আলোর নয়, পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে শব্দের।

কফি এসে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, কিন্তু সূর্য দাদু, প্রতিফলনটা হয়ে কিসে ? ওখানে তো ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছু দেখলাম না।

সূর্য দাদু আমার কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, সেটাই সব চাইতে মজার ! কারণ শব্দকে প্রতিফলিত করেছে হাওয়া।

হাওয়া !

হ্যাঁ। এটা সম্ভব এবং এটা প্রথম লক্ষ্য করেন একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী। তাঁর নাম টিন্‌ডাল। সমুদ্রের ধারে শব্দের এই রকম প্রতিফলন তিনি লক্ষ্য করেন। এ এক ধরণের প্রতিধ্বনিরই মত, কিন্তু রহস্যময় এই প্রতিধ্বনির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ এক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি ঘটাচ্ছে হাওয়ারই কোনো একটা বিশেষ স্তর, যাকে টিনডাল বলেছেন এ্যাকস্টিক্ ক্লাউড্। অবশ্য এ্যাকস্টিক ক্লাউড, দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই। চোখের কাছে তা অদৃশ্য, হাওয়ার মতই স্বচ্ছ। কিন্তু তা শব্দকে প্রতিফলিত করে।

কিন্তু এরকমটা হয় কেন ? — লালজী জানতে চান।

হ'তে পারে নানা কারণে।—সূর্য দাদু বললেন—দু'টি বায়ু স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য বা আর্দ্রতার পার্থক্যের ফলেও এমন হওয়া সম্ভব। আমার ধারণা শীতের রাত্রে মাঝে মাঝে ঐ বিশেষ জায়গায় একটা অ্যাকস্টিক ক্লাউড সৃষ্টি হয় এবং গাড়ীর হর্ণের শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা গেলে ড্রাইভার তাকে সত্যিকার একটা গাড়ীর হর্ণ ভেবে গাড়ীটিকে খুঁজতে থাকে। তারপর খুঁজে না পেয়ে প্রথমে অবাক হয় তারপর নার্ভাস হয়ে পড়ে। যত ঐ ক্লাউডের দিকে এগোতে থাকে অদৃশ্য গাড়ীর শব্দও ততই কাছে আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গাড়ীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আর এই ভাবেই ঘটে যায় মারাত্মক দুর্ঘটনা।

বাঃ ! এ তো পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা !—রঞ্জিত উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু আপনি যে বললেন, এটা একরকম ভূতুড়ে ব্যাপার !

সূর্য দাদু মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু ! ভূতুড়ে নয়, বলেছি ভৌতিক। ভৌত থেকে ভৌতিক। তা, ঘটনাটা যে একটা ভৌত ঘটনা এটা স্বীকার করবেন তো নাকি ?

মাথা চুলকে লালজী বললেন তা আর স্বীকার না ক'রে উপায় কি !

আকাশবাণী শিলিগুড়ি পিন – 734401

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট' অবলম্বনে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
ছবি- গৌতম কর্মকার

এবারে এক জন স্বপ্নে দেখলেন - পানের জল স্নান করে তোমরা নষ্ট করেছো। সেই পাপে জল বন্ধ হয়ে গেছে। স্নানের লোভ যদি ত্যাগ করতে পারো, তবেই আবার তোমরা জল পাবে।
বাহ, তারপর?
স্নানাগার ভেঙে দেওয়া হোল। জল দেখা দিল আবার। তখন থেকেই ফোয়ারাটির নাম দেওয়া হয়েছে - পবিত্র ফোয়ারা।
বলো কি! এযে প্রায় রূপকথার গল্পের মতো শোনাচ্ছে।
পথে দেখা হোল এক নাইটের সঙ্গে, আমারই সাজানো নাইট। নাম - স্যার ওজানা। গায়ে-মাখা সাবান আর দাঁতের মাজন বিক্রী করে বেড়ায়।
একি, স্যার! আপনি এখানে? কোথায় যাচ্ছেন?
পবিত্র উপত্যকায়।
যাবেন না স্যার। সেখানের ফোয়ারা আবার শুকিয়ে গেছে। ভীষণ জলকষ্ট। চারপাশে হাহাকার। সাহায্য পাবার আশায় পাদরীরা আপনার কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি তো ছিলেন না। তাই মার্লিনকেই আনা হয়েছে।
জল কিন্তু এখনো মেলেনি।
ঠিক আছে, তুমি আমার চিঠি নিয়ে ক্যামেলটে যাও। ক্লারেন্সকে ওটা দেবে।
প্রিয় ক্লারেন্স, রাসায়নিক বিভাগ থেকে দুটো এক নম্বর, দুটো চার নম্বর আর ছটা পাঁচ নম্বর পত্রপাঠ পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে দুজন কারিগর। সম্ভব হলে তুমিও আসতে পারো।
হাইয়ু মাকামাক।
অনেক পথ পেরিয়ে অবশেষে পবিত্র উপত্যকায় পৌঁছলাম।
উঃ, কী করুণ সুরে ঘন্টাটা বাজছে! যেন হাহাকার করে বলছে — জল-জল·· জল···
22

খবর পেয়ে ছুটে এলেন মঠাধ্যক্ষ।
আহ্, তুমি এসেছো?
দয়া করো বৎস। তোমার অপার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের স্বল্পর জলটুকু ফিরিয়ে দাও!
কথা দিতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। আচ্ছা, মার্লিন ক'দিনের সময় চেয়েছে?
আরও দু'দিন। কিন্তু আশার কিছু তো দেখছি না।
দেখুক না, চেষ্টা করতে দোষ কী? যদি না পারে তখন নাহয় আমি দেখবো।
মার্লিন ওদিকে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া সৃষ্টি করে পিশাচদের ডাকাডাকি করুক। আর আমি-গোপনে গোপনে সন্ধান করে দেখি-ফোয়ারার উৎসমুখ কোথায় লুকিয়ে।
পরের দিন রাতে ক্লারেন্স আর একজন কারিগর নিয়ে আমি গোপনে পথে নামলাম।
আস্তে, কেউ যেন জানতে না পারে।
হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের তলদেশে এসে পৌঁছলাম।
ঐ দেখুন স্যার, একটা গুহা।
ওর ভিতরেই আসল রহস্য। লণ্ঠনটা জ্বালো।
গুহার ভিতরে পায়ে পায়ে ঢুকলাম।
একটা বিরাট ইঁদারা, জলের বালতি, জল তোলার সরঞ্জাম। চমৎকার ব্যবস্থা!
23

অর্থাৎ ইঁদারা থেকে জল তুলে ফোয়ারার জলাধারে নিয়মিত পাঠিয়ে দেওয়া যেত। আর মানুষের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্যে ভাঁওতা দিয়ে গল্প ফাঁদা হয়েছিল। এখন যারা আছে তারা এর ভিতরের রহস্য জানে না। ভেবেছে সবই ঈশ্বরের তৈরী।
ইঁদারার জলও সম্ভবত শুকিয়ে গেছে, তাই ফোয়ারাও এখন শুকনো। মন্ত্র দিয়ে তাকে সচল করা যাবে না।
এখন একটাই সমস্যা — জলের উৎস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?
দড়ি বেয়ে নেমে গেলাম আমি। উহ, কী গভীর কূপ, প্রায় দু'শো ফুট। নামছি তো নামছিই। অবশেষে ইঁদারার নিচে এসে পৌঁছলাম।
ফাটল ধরেছে ইঁদারার দেয়ালে। জল আসছে আর ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
এক ফোঁটা জলও তাই জমছে না।
উপরে উঠে আসার পর···
শোন, কাল সারা দিন পাথরের টুকরো জড়ো করে সাজাও। রাতে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে ফাটলটা বন্ধ করতে হবে। খবরদার, কোনও খবরই যেন কেউ জানতে না পারে।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।
পরের দিন বিকেল — মার্লিন তখনো সমান তোড়ে মন্ত্রের ঝড় ছুটিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে —
কিহে, কিছু আশা আছে?
অসম্ভব, মানুষের যা সাধ্য তা এই তিন দিন ধরে করেছি। এক ভয়ংকর পিশাচ এই ফোয়ারার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাকে যে আঘাত করতে যাবে সে-ই মরবে। আর কখনও ও জল মানুষ পাবে না, পাবে না, পাবে না। বুঝেছেন?
হা ভগবান, তাহলে কী হবে?
24

পাতা কেন ঝরে / সমীর কুমার ঘোষ

শীঘ্রই শীতের হবে প্রস্থান এবং বসন্ত হবে জাগ্রত দ্বারে। গাছের শীর্ণ পাতা খসে যাওয়ার দৃশ্য শীতের বিদায়ক্ষণকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, গাছের এই পাতা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি কিছু শুধু মাত্র শীতেই সীমাবদ্ধ নয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, প্রায় সারা বছর ধরেই গাছ তার পাতা কিছু না কিছু হারায়, যদিও এই পাতা পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি শীত ছাড়া অন্য ঋতুতে আমাদের দৃষ্টি খুব একটা আকর্ষণ করে না। তবুও গাছের পাতা ফেলে দেওয়ার এই ধর্মের এক বিশেষ সুবিধা আছে, যা প্রাণীজগতে আর কারো নেই। ধরা যাক্, মানুষ যদি তার পুরানো ও প্রায় বিকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভাবে গাছের মত ফেলে দিতে পারত, তাহলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবশ ও বিকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আর চিন্তান্বিত হ'তে হ'ত না।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গত একশ বছর যাবৎ নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে গাছের এই পাতা ঝরে যাওয়ার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। পাতা গাছের যে অংশ থেকে পড়ে যায়। সেই বৃন্ত মুখে সূক্ষ্ম এক স্তর কোষের উদ্ভব হয় বলে যদিও একধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু এই যুক্তি সর্বজনপ্রিয় ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার যেহেতু শীতেই পাতা ঝরে যাওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়, সেজন্য কারো কারো মতে সূর্যালোক ও উষ্ণতার হ্রাসপ্রাপ্তিই এই ঘটনার কারন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, এক বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, যদি গাছের পাতার ফলকটি কেটে ফেলা হয়, তাহলে তখনই পাতাটি খুব শীঘ্রই ঝরে পড়ে। কিন্তু ফলকটি যদি আংশিকভাবে ছেঁটে দেওয়া হয় যাতে ফলকের সামান্য অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে পাতাটি বেশ ভালভাবেই জীবিত থাকে, অর্থাৎ পাতার ফলকের মধ্যে এমন কোন এক বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যা পাতা ঝরে পড়া প্রতিরোধ করে। বস্তুতঃ, পাতার ফলকের মধ্যে 'অক্সিন' নামে এক প্রকার হরমোন থাকে, যা পাতা খসে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। এই হরমোন, ফলক থেকে পাতার বৃন্ত মুখের দিকে প্রবাহিত হ'য়ে, পাতা ঝরে পড়াকে প্রতিরোধ করে। ফলকে যত বেশি পরিমাণ অক্সিন তৈয়ারী হয়, পাতার স্থায়িত্বও তত বাড়ে। কচি পাতার ক্ষেত্রে অক্সিন খুব দ্রুত তৈয়ারী হয় এবং সবচেয়ে বেশি তৈয়ারী হয় যখন পাতার দৈর্ঘ্য থাকে 60 থেকে 100 মিলিমিটার এর মধ্যে। দেখা গেছে যে, গাছের পাতার ফলক কেটে বাদ দিয়ে যদি বৃন্তের কাছে বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে অক্সিন প্রয়োগ করা হয়, তাহলেও পাতাটি বৃন্তচ্যুত হওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়। ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করে যে, পাতার ফলকে অক্সিন-এর অস্তিত্বই পাতাকে ঝরে পড়ার হাত থেকে বাঁচায়।

কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। কোন গাছের সমস্ত পাতার ফলক যদি ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে আবার দেখা যায় যে, পাতা ঝরে পড়ার ঘটনাটিও হ্রাস পায়। অর্থাৎ ফলকের উপস্থিতির পরিবর্তে অনুপস্থিতিও ক্ষেত্রবিশেষে পাতা খসে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। সুতরাং ফলকে অক্সিন হরমোনের উপস্থিতি যেমন পাতা ঝরা প্রতিরোধ করে, তেমনই ঐ একই ফলক এমন কোন বস্তু উৎপন্ন করে যা পাতা খসে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হিসাবেও কাজ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পাতার কোষের মধ্যে অবস্থিত ইথিলিনই এই কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাতা ঝরার ব্যাপারটি আবার গাছের অগ্রস্থ কোরকপত্রের দ্বারা উৎপন্ন অক্সিন হরমোনের পরিমাণের ওপরও নির্ভর করে। অগ্রস্থ কোরকপত্রে উৎপন্ন অক্সিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতা ঝরে পড়ার সহায়ক হিসাবেও কাজ করে। সুতরাং গাছের এই পাতা ঝরার ঘটনাটি প্রকৃত-পক্ষে 'অক্সিন-অক্সিন সাম্য'-এর ওপর নির্ভর করে। অক্সিন পাতা ঝরে পড়ার প্রতিরোধও যেমন, সহায়কও তেমন। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরানো পাতার ফলকে উৎপন্ন অক্সিন হরমোন, কচি অগ্রস্থ কোরকপত্রে উৎপন্ন অক্সিনের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, ততক্ষণ পাতার জীবন স্থায়ী থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে পুরানো পাতায় উৎপন্ন অক্সিনের পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবে বেশী হওয়ায়, পাতা ঝরে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, আশ্চর্য ভাবে একথা প্রমাণিত যে, একই হরমোন অক্সিন, পাতা ঝরার এবং তা প্রতিরোধের জন্য দায়ী, আর যতই আশ্চর্যজনক হোক না কেন, 'অক্সিন-অক্সিন সাম্যের' এই তত্ত্ব নির্ভুল ভাবে পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত। অবশ্য অতি বিশাল আকৃতির গাছের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সঠিক ভাবে প্রমাণিত নয়। তবুও যতদিন না পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন কোন তত্ত্বের আবিষ্কার ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলে এই 'অক্সিন-অক্সিন সাম্যের' স্বীকৃতি অবশ্যই গ্রাহ্য এবং গাছে উৎপন্ন একই হরমোনের দুই বিপরীতধর্মী কার্যক্ষমতার অদ্ভুত ও আশ্চর্য গুণ নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। সুতরাং কবিগুরুর সেই শাশ্বত প্রশ্ন ঃ

"শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস করা কোন্ সুরে"

এর উত্তর হয়ত কিছুটা পাওয়া গিয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতন।

"সমুদ্রের জল বিন্দুর মত আসুন আমরা একে অপরের সংগে মিলে মিশে থাকি। সমুদ্রের জল বিন্দু যদি মূল জল রাশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে তা শুষ্ক হয়ে যাবে। কিন্তু সমুদ্রে সেই বিন্দু বিন্দু জল রাশি যখন মিলে মিশে এক মহা সমুদ্রে পরিণত হয় তখন তারা কত সহজেই না বিশাল জাহাজকে তার বিস্তীর্ণ জল রাশির ওপর বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের মতই একথা আমাদের ক্ষেত্রেও সমান। কারন আমরা যে প্রকৃত পক্ষেই এক জন সমুদ্র।"

সমুদ্রের জল রাশির মত
মিলে মিশে এক হয়ে থাকুন।

ইণ্টারফেরন

সুজিত মুখোপাধ্যায়

ইণ্টারফেরন একটা সহজাত ওষুধ, যা কিনা ভাইরাস ইত্যাদি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের দেহতেই তৈরি হয়। আজ থেকে প্রায় 26 বছর আগেই এই প্রতিষেধকটির কথা প্রথম জানা যায়। এই মহৌষধটির আবিষ্কারক অ্যালিক্ আইজ্যাক এবং জে. লিন্‌ডেম্যান নামক লণ্ডনের ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের দুজন বিজ্ঞানী। এঁদের গবেষণায় জানা গেছে যে ইণ্টারফেরন একটি ক্ষুদ্র প্রোটিন বিশেষ, যা কিনা কোষের মধ্যে ভাইরাস অনুপ্রবেশের সময় ঐ পোষক কোষ থেকেই উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন ইণ্টাফেরন পোষক কোষকে তো ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা করেই, সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী কোষগুলোকেও সংক্রমণ থেকে বাঁচায়। যাইহোক ইণ্টাফেরনের নানান গুণ থাকা সত্ত্বেও এটিকে কিন্তু কোষ থেকে আলাদা করা বেশ কষ্টসাধ্য। ফলে বাইরে থেকে প্রয়োগকারী ওষুধ রূপে ইণ্টারফেরনকে আক্‌চার ব্যবহার করার সময় এখনও আসেনি। গবেষণাগারে কাজ থেমে নেই। সেখানে কিন্তু জোর চেষ্টা চলছে বেশী পরিমাণ ইণ্টারফেরনকে শরীর থেকে আলাদা করা যায় কিনা তার জন্য। এতে সাফল্যলাভ করতে পারলে আর কিছু না হোক অন্তত ওষুধ হিসাবে অসুখের বিরুদ্ধে এক জোরদার প্রতিপক্ষ পাওয়া যাবে। ইণ্টারফেরনের আর একটা নেতিবাচক দিকও আছে—তাহল অন্যান্য বায়োলজিক্যাল বস্তুর মতো প্রত্যেক প্রজাতির বেলায় একই উৎস থেকে পাওয়া ইণ্টারফেরনকে ব্যবহার করা চলে না। পরীক্ষার সাহায্যে সন্দহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিম্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ীদের দেহে উৎপন্ন ইণ্টারফেরন মানুষের (Homo sapiens) দেহে অকর্মণ্য।

আগেই বলেছি ইণ্টারফেরন স্বভাবে প্রোটীনধর্মী। আরও জানা গেছে যে এর আণবিক ওজন প্রায় 20,000। প্রত্যেক প্রজাতির ইণ্টারফেরনই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ এক প্রাণীর দেহে উৎপন্ন ইণ্টারফেরন অন্য প্রাণীর কোন কাজেই লাগে না। অর্থাৎ ইণ্টারফেরন Species specific। এই স্বাতন্ত্রতার জন্য দায়ী কয়েকটি কারণ। প্রথমতঃ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জায় তারতম্য এবং দ্বিতীয়তঃ কার্বহাইড্রেটের পরিমানের তারতম্য। অবশ্য আরও কিছু কারণ যে নেই তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কি আরও কিছু কারণ থাকলেও তা এখনও জানা যায়নি। অনেকে ইণ্টারফেরনকে হরমোন বলেও দাবী করেছেন। এ নিয়ে বিতর্কেরও শেষ নেই। হরমোনের সাথে ইণ্টারফেরনের অনেক পার্থক্যের মধ্যে প্রধান তফাৎটি হল—হরমোন এক জায়গায় উৎপন্ন হয়ে আর এক জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু ইণ্টারফেরনের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটে না। এটি যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানেই কাজ করে। তা যাই হোক ইণ্টারফেরন প্রটীনধর্মী এবং 'Panvaccine' হিসাবে কাজ করে। কারণ ইণ্টারফেরন প্রায় সব ভাইরাস দ্বারাই আক্রান্ত হতে পারে। কিম্বা অন্যভাবে বললে বলা উচিৎ —এটি প্রায় সব ভাইরাসকেই আক্রমণ করতে পারে। এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইরাসের জোরাল প্রতিষেধক হিসাবে তো ভ্যাকসিন বা টীকা আছে, তাহলে ইণ্টারফেরনকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন ? কারণটা খুবই প্রাসঙ্গিক। কেননা ভ্যাকসিন বা টীকা সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধেই প্রতিষেধক রূপে কাজ করে, যে ভাইরাস থেকে ঐ ভ্যাকসিন বা টীকাটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ইণ্টারফেরন এমনই একটা সহজাত প্রতিষেধক যা কিনা সব ভাইরাসের বিরুদ্ধেই সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এ হেন ধন্বন্তরীকে নিয়ে হৈচৈ করাটা কি খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক ?

ইণ্টারফেরন প্রাণীদেহে নানারকম পদ্ধতিতে কাজ করে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ কাজ বোধহয় কোষের মধ্যে ভাইরাসের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। ইণ্টারফেরন ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোষের ভেতর ছাতার মতো প্রতিরোধ (umbrella protection) গড়ে তোলে। যদিও এর বিরুদ্ধে সাড়া দেবার ক্ষমতা ভাইরাসের প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল। ইণ্টারফেরনের আর একটি কার্যক্ষম দিক হলো 'cysosttic' পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন দমন করা। হাল আমলে ইণ্টারফেরনের আরও দু রকম প্রতিক্রিয়ার কথা জানা গেছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের নাম 'inritro'

এবং 'in vivo'। যদিও একথা বলা হয়েছে যে ইণ্টারফেরন প্রত্যেক প্রজাতির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, তবুও এর ব্যতিক্রম যে নেই তা কিন্তু নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষের দেহের লিউকোসাইট ইণ্টারফেরন বাঁদর, গরু, বিড়াল, শুয়োর, খরগোশ এবং গিনিপিগদের দেহেও ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু মানুষের বেলায় কেবলমাত্র মানুষের নিজের ছাড়া বাঁদরের ইণ্টারফেরনও কার্যকরী। বাঁদর আমাদের নিকট আত্মীয় বলেই কি এমনটি ঘটে ?

মানব দেহে নানান উৎস থেকে ইণ্টারফেরনের নিঃসরণ ঘটে। উৎসগুলো হল লিউকোসাইট, অ্যামনিয়ন, ফাইব্রোব্লাট এবং লিমফোব্লাসটয়েড। অবশ্য এগুলোর মধ্যে সব চাইতে জোরাল উৎসটি হল লিউকোসাইট। বলাবাহুল্য ল্যাবরেটরীতে এই লিউকোসাইট থেকে ইণ্টারফেরন আলাদা করার কাজে সাফল্য লাভ করা গেছে। 400 মিলিমিটার রক্তের ব্যাগ থেকে প্রায় 1-2 মিলিয়ন একক ইণ্টারফেরন আলাদা করা গেছে। 1976 সালে ফিনল্যাণ্ডে 10^{11} আন্তর্জাতিক একক (I. U.) মানব লিউকোসাইট ইণ্টার ফেরন সর্বপ্রথম পৃথক করা সম্ভব হয়। যদিও ইণ্টারফেরনের কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তাহলেও এর সবচেয়ে সুবিধাজনক দিকটা হল ভাইরাস আক্রান্ত কোষের ওপর ক্রিয়া করে এ ভাইরাসকে ধ্বংস করে কিন্তু আক্রান্ত কোষের কোনরকম ক্ষতি করে না।

1975 সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ্ মেডিসিনের টমাস্ সি মেরিগ্যান এবং তাঁর সহকারীরা জনৈক হেপাটাইটিস্ রোগীকে ইণ্টারফেরন ইঞ্জেকশান করে সাফল্য লাভ করেন। ডঃ মেরিগানের অভিমত হল সাধারণ সর্দি জ্বরেও এই চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ কার্যকরী। একে ওষুধ হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করার সব চাইতে বড় অসুবিধাটা হল এর সরবরাহের অপ্রতুলতা। এই কারণে চোখের ভাইরাস সংক্রমণ, অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনজনিত ভাইরাস সংক্রমণ, কিডনি প্রতিস্থাপনজনিত ভাইরাস সংক্রমণ —ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র সীমিত ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ইণ্টারফেরন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলে অস্টিওয়ারকোমা, প্যাপিলোমা, মাইব্রলেসা, বুক এবং ফুসফুসের ক্যানসার—প্রভৃতি টিউমারঘটিত রোগেও ইণ্টারফেরন ইঞ্জেকশান করা সম্ভব হবে। সেদিন হয় তো বেশি দূরে নয় যেদিন এই ইণ্টারফেরন ইঞ্জেকশান করেই বিভিন্ন দুরারোগ্য অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মানুষ দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

99, এম. এন. কে রোড (নর্থ), কলকাতা-35

ছড়া

জলে আছে অক্সিজেন

কমল চক্রবর্তী

জল যদি পাও কাছে
করে নাও পান।
এতে যে অক্সিজেন
কি তারি প্রমাণ ?
ক্লোরিন যদি নেয়
জলেরই সঙ্গ,
অক্সিজেন যায় চলে
নয় কোন রঙ্গ।

লাফিং গ্যাস (N_2O)

কমল চক্রবর্তী

কেউ বলে হাসি আসে,
কেউ বলে না,
ওর ফাঁদে দিলে ধরা
পার পাবে না।
বেশি যদি নাও শুঁকে
পাবে যে আমেজ,
আমেজেই যাবে মারা
দেহেতে নিস্তেজ।

বিজ্ঞানীর টুকিটাকি

অমরনাথ রায়

রবার্ট বয়েল

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ রসায়ন বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল গ্যাসের উপর চাপের প্রভাব সম্পর্কিত বয়েলের সূত্রের স্রষ্টা। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি বড় ব্যতিব্যস্ত হতেন। কিন্তু কেন তাঁরা এই দুর্বলতা ?

বয়েলের চিকিৎসকদের মতে বয়েল তিনটি প্রধান রোগে ভুগতেন। প্রথমতঃ অতিরিক্ত পড়াশুনা করা, দ্বিতীয়তঃ স্নায়বিক দৌর্বল্য হেতু অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া এবং তৃতীয়তঃ নিজেই নিদের ডাক্তারী করার বাতিক। —এই তিনটি রোগের কবলে পড়ে রবার্ট বয়েল নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।

আইজাক নিউটন

বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন ছেলেবেলায় দৌড়ানো বা লাফানোয় মোটেই পারদর্শী ছিলেন না। তবুও একবার এক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তিনি লাফ দেওয়ার এক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধ্য হন।

মাঠে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছিলো। আর সুখের বিষয় এই যে, যে অভিমুখে তাঁকে লাফাতে হবে—সেই অভিমুখেই গতি ছিল হাওয়ার। বালক বিজ্ঞানীর মনে তখনই বালকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। তিনি বুঝলেন যে হাওয়ার অভিমুখে লাফ দিলে তিনি লাভবানই হবেন।

এতক্ষণ মনে তাঁর সংশয় ছিল, ভয় ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করার পরই তাঁর সে ভয় দূর হলো। নির্ভয়ে লাফ দিলেন তিনি হাওয়ার গতির অভিমুখে। হ্যাঁ, ফলও সঙ্গে সঙ্গে মিললো। ঐ লম্ফ প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হলেন।

রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিকান

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হব হব। বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিকান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণাগারে বসে বিখ্যাত Oil drop experiment-টি করে চলেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই বিখ্যাত পরীক্ষাটির ফলেই একটি মাত্র ইলেকট্রনের তড়িতাধান কতো তাও নির্ণীত হয়েছিল এবং এই আবিষ্কারের জন্যেই 1923 খ্রীষ্টাব্দে মিলিকান পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

যাই হোক্ সন্ধ্যে হতে না হতেই তাঁর মনে পড়ে গেলো যে বাড়ীতে কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথিকে রাত্রিকালীন আহারের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতিথিরা সস্ত্রীক হয়তো তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন।—এটা মনে হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর ল্যাবরেটরী থেকে বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে টেলিফোন ক'রে জানালেন যে, 'এখন আমি একটি পর্যবেক্ষণে খুব ব্যস্ত আছি, তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরব।'

সম্মানিত অতিথিরা যথা সময়ে মিলিকানের বাড়িতে এলেন। শ্রীমতী মিলিকান তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন এবং তারপর বললেন, 'আমি খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার স্বামীর আর্জ বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে। তিনি ফোন করে আমায় জানিয়েছেন যে ল্যাবরেটরীতে তিনি কাপড় কাচা ও তা ইস্ত্রি করার কাজে একটু ব্যস্ত আছেন। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরবেন।'

সমবেত অতিথিরা মুখে কিছুই বললেন না, কেবল একটুখানি মুচকি হাসলেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে "ধান শুনতে কান শোনা"। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। শ্রীমতী মিলিকান ধান শুনতে কান শুনেছিলেন।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন

কথিত আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এর অধ্যাপকেরা রামণকে বিজ্ঞানের ক্লাশে উপস্থিত না থাকলেও চলবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এর কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছিলেন, 'আমাদের কাছ থেকে ওর নতুন কিছুই শেখার নেই। সবই ও জানে।'

পরবর্তীকালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই পদে নিযুক্ত করতে হলে প্রার্থীর বিদেশে কিছুকাল শিক্ষকতা বা গবেষণার থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই স্যার আশুতোষ রামনকে ইংলণ্ডে গিয়ে কিছুকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রস্তাব দিলেন। রামন কিন্তু বিদেশে যাবেন না বলে স্রেফ জানিয়ে দিলেন। তখন

নিরুপায় হ'য়ে স্যার আশুতোষ ঐ পদটিতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত যে শর্তটি ছিল তা সিনেটে পাশ করিয়ে নিয়মানুগভাবে তুলে নিলেন। ফলে ঐ পদটি গ্রহণের ক্ষেত্রে রামন এর আর কোন বাধাই রইলো না।

অ্যালবার্ট আইস্টাইন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিজের বেশভূষার প্রতি মোটেই নজর দিতেন না। বেশির ভাগ সময়েই তিনি জরাজীর্ণ বেশে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন।

একবার এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রে যোগ দিতে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে একটি হোটেলে ঘর ভাড়া করতে গেলেন আইন স্টাইন।

হোটেলের ম্যানেজার ঐ বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে চিনতে পারলেন না। উস্কোখুস্ক চুল, ভাবুক প্রকৃতির এবং জরাজীর্ণ বেশের লোকটিকে তিনি অন্য চোখে দেখলেন এবং তাঁর কাছে অগ্রিম ঘর ভাড়া চাইলেন। আত্মভোলা আইন-স্টাইন ঘরের অগ্রিম ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তবেই হোটেলে ঢোকার প্রবেশপত্র পেলেন।

একবার এক সভায় আমন্ত্রিত হ'য়ে অ্যালবার্ট আইন-স্টাইন সেখানে গিয়েছিলেন। ঐ সভা প্রাণবন্ত ছিল না। তাই দেখে আইনস্টাইনের এক বন্ধু তাঁকে বললেন, 'এই সভায় নিশ্চয়ই আপনি খুব একঘেয়েমী বোধ করছেন?' উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'মোটেই তা নয়। এই রকম অনুষ্ঠানে আমি আমার মনের পশ্চাতে ফিরে যাই এবং সেখানে বেশ আনন্দ সহকারেই থাকি।'

জর্জ স্টিফেনসন

একদা স্টিফেনসন তাঁর এক ভূ-বিজ্ঞানী বন্ধুকে একটি চলন্ত ট্রেন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বেকল্যাণ্ড, তুমি বলতে পার, ট্রেন চলে কিসের শক্তিতে?'

উত্তরে বেকল্যাণ্ড বলেন, 'কেন, তোমার তৈরি বিস্ময়কর স্টীম ইঞ্জিনের উপর রাখা চালকের হাতের শক্তিতে।'

ঃ না, হলো না।

—ইঞ্জিনের বয়লারের নীচে যে আগুন জ্বলে, তার শক্তিতে।

ঃ 'আবার ভুল করলে ভাই', বললেন স্টিফেনসন।

'আসলে স্টীম ইঞ্জিন চলে সৌর শক্তিতে। সুদূর আকাশে রয়েছে সূর্য, যা অসীম শক্তির আধার। ঐ সৌরশক্তির প্রভাবে আদ্যিকালে যে সব গাছপালা সৃষ্টি হয়েছিল, ভূ-আন্দোলনের ফলে তারা মাটি চাপা পড়ে যায়। কোটি কোটি বছর মাটির তলায় সমাধিস্থ থেকে তারাই কয়লায় রূপান্তরিত হয়। আর ড্রাইভার সেই কয়লা ছড়িয়ে দেয় বয়লারকে প্রজ্জ্বলিত রেখে স্টীম উৎপাদন করতে। কাজেই ইঞ্জিন ট্রেনকে চালায় যে শক্তির বলে, সেই শক্তি হলো সৌরশক্তি।'

লেভ ল্যাণ্ডাউ

সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিজ্ঞানীরা অল্প বয়সেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন রেখে যান। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লেভ ল্যাণ্ডাউ' পদার্থবিজ্ঞানীরূপে তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

একদা এক যুবক গবেষকের গবেষণাপত্র পড়তে পড়তে গবেষককে ল্যাণ্ডাউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমার বয়স কতো?'

গবেষক যুবক জবাব দিলেন, 'আটাশ বছর হবে।' ল্যাণ্ডাউ তখন বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এতো কম বয়স! অথচ এখনও বিজ্ঞানী হিসাবে তুমি সুপরিচিত হ'য়ে উঠতে পার নি। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার বই কি।'

সুন্দর
ও মজবুত
জুতো মানেই
রাদু

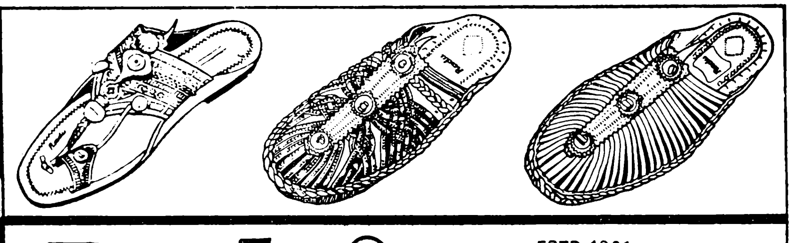

Radu®
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
ESTD. 1901
75A, COLLEGE STREET CALCUTTA-700 073
PHONE: 31-2402
18, GARIAHAT ROAD, CALCUTTA-700 019
PHONE 42-8393

আবহাওয়া ও আধুনিক বিজ্ঞান

আবহাওয়া ও আমরা ঃ অপরাজিত বসু
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১০·০০

আমাদের জীবনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব খুবই বেশি। ঈশানের পুঞ্জমেঘ যখন অন্ধবেগে বাধাহীন ভাবে ছুটে চলে আসে, বিবর্ণ-বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা যখন উড়ে যায় বিপুল নিঃশ্বাসে, আনন্দে আতঙ্কে আমরা শিউরে উঠি কালবৈশাখীর প্রলয় নাচনে অথবা যখন বসন্তের বাতাস উতলা আকুল হয়ে দেহে স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ আনে তখন মনটা কত আনন্দেই না নেচে ওঠে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত সব ঋতুর আগমনই আমরা অল্পবিস্তর বুঝতে পারি। আবহাওয়া ভাল থাকলে আমাদের মনটাও ভাল থাকে। অন্য দিকে গ্রীষ্মের অসহ্য দাবদাহ, প্রচণ্ড শীত অথবা অতিবৃষ্টি আমাদের মেজাজটাও অনেক সময় দেয় বিগড়ে। খবরের কাগজে রেডিও, টিভিতে আজকাল আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানিয়ে দেয়, উৎসাহী মানুষ আগে থেকে সে খবর জেনে নিয়ে ছাতা বগলে নিয়ে বেরোয় অথবা সেটা তুলে রাখে। আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়ায় আগাম খবর জানা অনেকটা সহজ হয়েছে।

অপরাজিত বসু 'আবহাওয়া ও আমরা' গ্রন্থটি লিখে একটা কাজের কাজ করেছেন। বাংলা ভাষায় বিশেষজ্ঞের লেখা বিজ্ঞান গ্রন্থ কদাচিৎ চোখে পড়ে। এখানে বিশেষজ্ঞ বলতে বুঝতে হবে যিনি বিজ্ঞান জানেন এবং বাংলা ভাষায় যাঁর দখল রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ দুটো গুণেরই অধিকারী। এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বাতাসের উপাদান, আয়োনোস্ফিয়ার, বায়ুস্রোত, কালবৈশাখীর বিজলী চমক, সাইক্লোন, ঋতুবৈচিত্র্য, ভারতের জলবায়ু এবং সর্বোপরি আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পাঠকের কৌতূহলকে উসকে দেয়। বাংলা ভাষায় আবহাওয়া বিজ্ঞানের উপর লেখা কোনও গ্রন্থ এর আগে চোখে পড়েনি। কাজেই গ্রন্থটি নূতনত্ব ও সেই সঙ্গে অভিনবত্বেরও দাবী রাখে! আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের বিজ্ঞান পুস্তিকা গ্রন্থমালায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

—পার্থসারথি চক্রবর্তী

পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ কি এক?

কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ ॥ আবদুল্লাহ আলমুতী
বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমী ॥ ঢাকা ॥ 23·00

ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলা দেশে বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য রচনায় যে সব সাহিত্যিক ব্রতী আছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মুতীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কুড়িখানি গ্রন্থের রচয়িতা এই লেখক সম্প্রতি যে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন তার নাম 'কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ', এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন দুই পথিকৃৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

আশী পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি ছোটদের জন্যে বিশেষ ভাবে লেখা এবং দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থ পাঠে শুধু যে ছোটরাই অনেক কিছু জানবে তা নয়, বড়দের অজানা অনেক তথ্যও আছে এতে।

পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ কি এক? না, এই দুই শব্দের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। কি তফাৎ, লেখক তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের চারপাশে অসংখ্য কীটপতঙ্গ রয়েছে, কিছু কিছু চেনা, কিছু কিছু অচেনা। কিছু কিছু মানুষের বন্ধু, কিছু কিছু মানুষের শত্রু। কারা কারা বন্ধু ও কারা কারা শত্রু তা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কেন বন্ধু, কেন শত্রু তাও বুঝিয়ে বলেছেন।

রঙিা পোকা, কাঠি পোকা, জোনাকী পোকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতের ফড়িং, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, বোলতা, কুমোর পোকা, মাছি, মৌমাছি, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, মশা, মথ এবং মথ থেকে রেশম উৎপাদন, আখের পোকা, আম গাছের পোকা, ধান গাছের পোকা, পাট গাছের পোকা ইত্যাদি অনেক কীটপতঙ্গের চেহারা, চালচলন ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন লেখক—সুন্দর ও সাবলীল ভাষায়। শুধু তাই নয়, তিনি আধুনিক কীটনাশকদের সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে।

লেখকের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। অসংখ্য ছবি, বিশেষ ক'রে রঙিন ছবি, ছোটদের মন ভোলাবে। ছাপা ঝরঝরে, প্রচ্ছদ মনোরম। পড়তে শুরু করলে শেষ না ক'রে ওঠা যায় না—এমনই বই এটি। গ্রন্থকার, প্রকাশক, চিত্রশিল্পী—সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এমন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্যে। বাংলার বিজ্ঞান বিষয়ক শিশু সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ আবদুল্লাহ আল-মুতী রচিত 'কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থখানি। এপার ও ওপার বাংলায় আলোচ্য গ্রন্থখানি অবশ্যই সমাদৃত হবে।

—অমরনাথ রায়

Our Respectful Homage

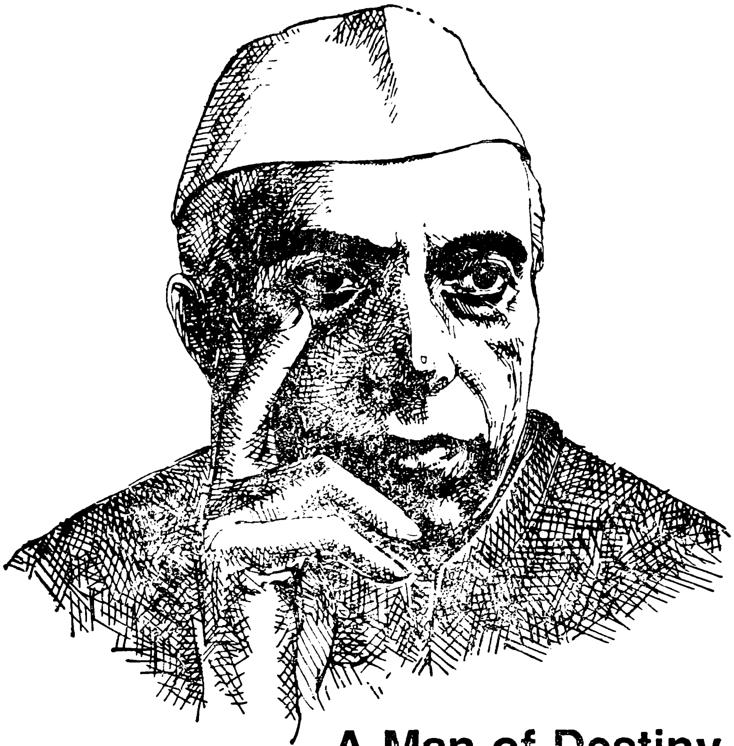

A Man of Destiny
A Maker of History
A Liberator of Humanity

" He could kindle in a whole nation the fire that burned within him and interpret its spirit to itself. Posterity will look upon him as one of the great liberators of humanity."

— Sarvepalli Radhakrishnan

SOUTH EASTERN RAILWAY

আধ ডজন চটজলদি

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

যার বুদ্ধি যত ধারালো সে তত চটপট জবাব দিতে পারে। চট করে জবাব দিতে গেলে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। যত গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনবে তত তাড়াতাড়ি আর সঠিকভাবে তা বুঝতে পারবে। একটা প্রচলিত চটজলদি শোনো।

একটি ট্রেন হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল যেতে সময় নেয় ৪0 মিনিট। ঐ ট্রেনটি একই স্পীডে যখন ব্যাণ্ডেল থেকে হাওড়া আসে তখন তার সময় লাগে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট। কেন?

সহজ হলেও ধাঁধাটা আমার খুব ভালো লাগে। দ্যাখো ৪0 মিনিট,1 ঘণ্টা 20 মিনিট যে আসলে একই তা বুঝতে চট করে অসুবিধাই হয়।

এখানে ছ'টি ঐ জাতের প্রশ্ন দিলাম। তোমরা চট করে তার উত্তর দাও আর বন্ধুদের ওপর প্রয়োগ করো।

1) একজন জাহাজের জানালা দিয়ে সমুদ্রের জোয়ারের জল বাড়া দেখছিল। প্রতি মিনিটে এক ফুট করে জল বাড়ছিল। এখন জানালার পনেরো ফুট নিচে জল। কতক্ষণে জল জানালা ছোঁবে?

2) আমি কাল আলোর সুইচটা অফ্ করে বিছানায় শুতে গেলাম। সুইচ থেকে বিছানা দশ ফুট দূরে অথচ ঘর অন্ধকার হওয়ার আগেই আমি বিছানায় চলে গেলাম। কিভাবে?

3) জলের নিচে একটি দেশলাই কাঠি জ্বালতে পারবে?

4) ঘরের মধ্যে একটা বোতল রাখো তারপর তার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকো। কেমন ভাবে তা করবে?

5) এক অদ্ভুত ভদ্রলোককে জানি যে খেলা শুরু হওয়ার আগেই সঠিক স্কোর বলে দিতে পারে। কেমন করে?

6) পাখি বিক্রেতা তার ময়নাটা বিক্রীর সময় ক্রেতাকে বলল— 'এ ময়না যা শোনে হুবহু তাই নকল করতে পারে'। ক্রেতা কদিন বাদে ময়নাটা ফেরৎ নিয়ে এলো। বলল – 'তুমি যা বলেছিলে ময়না তার কিছুই পারে না।' বিক্রেতা কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিল। তুমি কী বলো?

বুদ্ধিশুদ্ধি : তলোয়ারের খাপ-এর উত্তর।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

ক্যুইজ কনটেস্ট
ডিসেম্বর '88 VII—VIII
গ্রেড—I

1. এটি কিসের ছবি ?

2. তড়িৎপ্রবাহের ফলে কোন ধরনের তারে দ্রুত তাপ উৎপন্ন হয় ?

a) মোটা তারে (b) সরু তারে।

3 একটি বেতার কেন্দ্র থেকে 1000KHz কম্পাঙ্কের তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কতো ?

4. মটরশুঁটি কি প্রকার ফল ?

5. একটি ডানাবিহীন পতঙ্গের নাম বল।

6. কোন্ গাছের উপক্ষার হলো ভোসিসিন ?

7. 'আগ্রা ফোর্ট' কে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

8. লেনিন-এর মৃতদেহ কোথায় শায়িত আছে ?

9. শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ?

10. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতো সময় লাগে ?

গ্রেড II

ক্যুইজ কনটেস্ট
ডিসেম্বর '88 IX—X
গ্রেড—II

1. আর্কিমিডিস স্ক্রু কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?

2. LACHRYMATORS কি জিনিস ?

3. ভারতের কোন্ রাজ্য তিনদিকে বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবৃত ?

2 ইংলিশ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য কতো ?

5 এটি কিসের ছবি ?

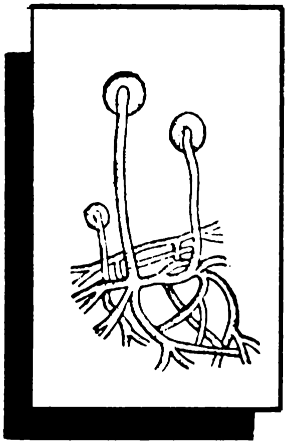

6. কোন্ রানী সবচেয়ে কম সময় রাজত্ব করেছিলেন ?

7. কোন্ পাখি নিজে বাসা আদৌ বানায় না ?

8. NDC বলতে কি বোঝায় ?

9. কে প্রথম নেহরু পুরস্কার লাভ করেন ?

10. হেলসিংকি কোন্ দেশের রাজধানী ?

গ্রেড III

ক্যুইজ কনটেস্ট
ডিসেম্বর '88 XI—XII
গ্রেড—III

1. যে কোষ থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয় তার নাম কি ?

2. পশ্চাৎপদ নেই এমন একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লেখ।

3. প্রথম কোন ভারতীয় মহিলা প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়েছিলেন ?

4. বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতি-সম্পন্ন মাছের নাম কি ?

5. কোন্ ভারতীয় মহিলা সর্ব প্রথম সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন ?

6. সর্বপেক্ষা শক্তিশালী ADHESIVE এর নাম কি ?

7. মানব দেহের সবচেয়ে ছোট হাড়ের নাম কি ?

8. মরিচাহীন ইস্পাতের প্রধান ধাতব উপাদানগুলির নাম কি ?

9. মুঘল রাজত্বকালে শিক্ষিত ভারতীয় কোন্ ভাষায় কথা বলতেন ?

10. এটি কিসের ছবি ?

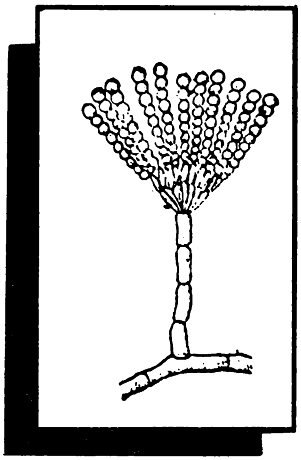

পাশাপাশি ঃ শংকর দে

2. একটা মৌলিক পদার্থ। 5. বাড়ির কার্নিসে অথবা ভিজে-স্যাঁতসেতে জায়গায় গজায়। 7. একটা মৌচাকে একটিই মাত্র থাকে। 8. 'চিহ্ন' প্রবর্তনকারী বিজ্ঞানী। 9. মাছের পেটের নিচের ছিদ্রটির নাম। 10. পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি। 14. তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের তরলে পরিণত হওয়াকে বলে **উপর নিচ ঃ**

1. রক্ততঞ্চনের পর ক্ষতস্থান হইতে নির্গত বর্ণহীন রসকে বলা হয়। 2. এক ধরনের ধাতু। 3. মানবদেহের বর্জনীয় পদার্থ। 4. যে রক্তবহা নালীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছায় তাকেই বলা হয়। 6. আপেলে যে অ্যাসিড পাওয়া যায়। 7. একটি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের নাম। 8. বীজের অঙ্কুরোদ্গমের প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে একটি। 9. একটি তরল ধাতু। 11. এক ধরনের শাক, যা ডোবা-জলাশয়ে জন্মায়। 12. গাণিতিক ক্রিয়ার একটি পদ্ধতি। 13. বংশগতির একক।

261 শরৎ বসু রোড, কল 65

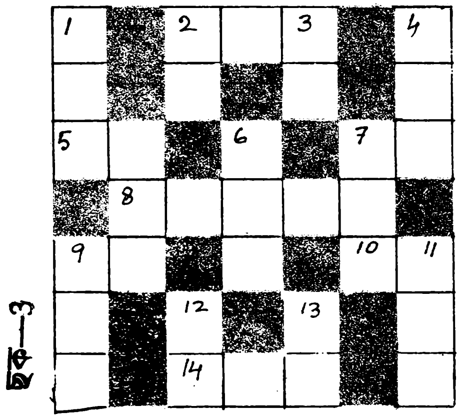

আই-কিউ-টেস্ট, ডিসেম্বর '88

1. নিচের সংক্ষেপিত নামগুলির পুরো নামগুলো জানাও ঃ

(a) N. C. C. (b) M. C. C. (c) M. I. S. A (d) N. B. (e) U. N. I.

2. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি কত ?

6 12 24 48

2 4 16 —

3. কচুরি পানার পত্রবৃন্ত বায়ুস্ফীত হয়—

(a) ভেসে থাকবার জন্য (b) বংশ বৃদ্ধির জন্য (c) খাদ্য সঞ্চয় করবার জন্য।

4. কোন্ মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংকের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে বেশি ?

(a) গ্যালিয়াম, (b) হোলমিয়াম, (c) ক্যাডমিয়াম।

5. কোন বাতির মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ 1 শতাংশ কমলে বাতি কর্তৃক গৃহীত শক্তির হার কমবে—

(a) 1·50 শতাংশ, (b) 1·99 শতাংশ, (c) 3·01 শতাংশ, (d) 4 শতাংশ।

সেপ্টেম্বর, 88 VII-VIII গ্রেড-I

1. The great Indian bustard 2. ABEL JANSZOON TASMAN, 1642 খ্রীস্টাব্দে। 3. 1869 খ্রীস্টাব্দে। 4. সম্রাট অশোক। 5. ROMULUS AUGUSTUS. 6. সিড্‌নী। 7. SAN SALVADOR 8. 340 মিটার প্রতি সেকেণ্ডে। 9. প্রায় 156 গ্রাম। 10. বাঙ্গালোর।

সেপ্টেম্বর, 88 IX-X গ্রেড-II

1. 45° 2. 300 3. হিমোগ্লোবিনোমিটার। 4. স্ট্রাসবার্গার, 1875 খ্রীস্টাব্দ 5. উদ্ভিদের নাম WEAWITSCHIA MIRABILIS মরুভূমিতে 2000 বছর পর্যন্ত বাঁচে। 6. 11km / Sec 7. The old man and the sea 8. উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 9. মিলিমানজারো (6012মিটার উঁচু) 10. ঘূর্ণনের গতিবেগ।

সেপ্টেম্বর, 88 XI-XII গ্রেড-III

1. The Australiam desert 2. দামাস্কাস। 3. THIBAW. 4. মাত্র একবার, 1924 খ্রীস্টাব্দে। 6. CHARLES EVANS-এর নেতৃত্বে 25শে মে, 1955 6. মহারাষ্ট্র। HgS. 8. ARTHUR WYNNE of Liverpool, U. K. 9. British Broadcasting Corporation 10. SICKLEBILL

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট সেপ্টেম্বর '88-এর সমাধান

1. (c) সঙ্গে সঙ্গে বাস থামিয়ে সহ-যাত্রীটির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

2. 9 সংখ্যাটি। অন্যগুলি মৌলিক।

3. (a) রান্না।

5. (a) ইলেকট্রন।

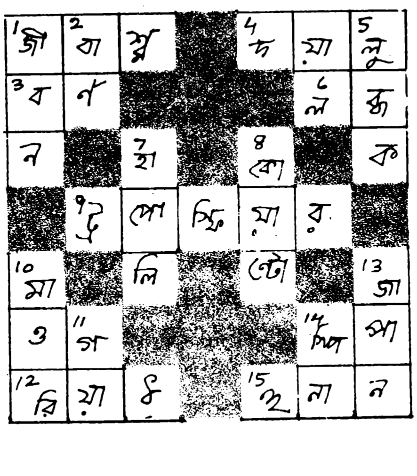

সুপার কুইজ কনটেস্ট সমাধান 1988

1. সরলতা, পবিত্রতা, সততা ও শান্তির প্রতীক। 2. ঐন্দ্রিলা। 3. পাক। 4. হর্সপোলো খেলায় যে ব্যাট ব্যবহৃত হয়, তার নাম। 5. চল্লিশটি। 6. কেরাটিন। 7. অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেটার 'অ্যালান বর্ডার'। 8. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 9. নব-বিধান। 10. আই. কিউ বা বুদ্ধ্যাংক। 11. ট্যালুক। 12 মিথ্যা। 13. গঙ্গার মূল উৎস 'গোমুখ'। 14. Ceres, ব্যাস প্রায় 955 কিলোমিটার। 15. Pidurutalagala (2524 মিটার উঁচু)। 16 ডাইনোসোর। 17. লক্ষ্ণৌ এর ন্যাশন্যাল হেরল্ড। 18. Vengayil Krishna Krishna Menon.

সুপার আই-কিউ-টেস্ট-এর সমাধান

1 (a) Respondez Sil Vous Plait
(Reply if you please)
(b) International Parliamentary Union
(c) Press Asia International
(d) Zero Energy Thermonuclear Agency
(e) Zero Population Growth
2. (a) বিপক্ষকে তোমার মতামত বোঝাবার আরও চেষ্টা করবে।

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতার উত্তর ছক 1

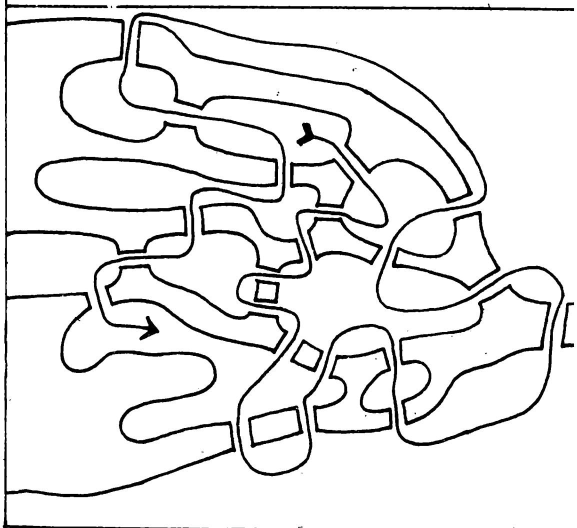

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতার উত্তর ছক 2

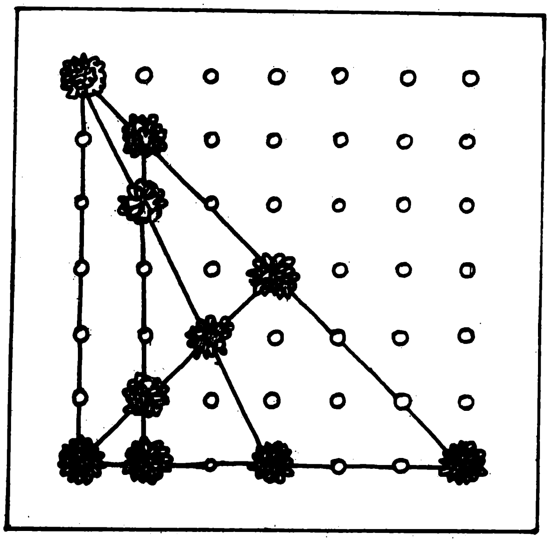

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকতে পারোনি অথচ সফল প্রতিযোগী তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার 31 জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর—ডাকে under certificate of posting-এ পাঠানো হয়েছে। যদি কেউ না পাও তাহলে স্হানীয় Post master-এর কাছ থেকে একটি Non-receipt certificate-এর কপি সহ পুনরায় আবেদন করতে পারো।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

সেপ্টেম্বর' 88-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যারা সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী** c/43, জয়শ্রী পার্ক বেহালা, কলকাতা—700034.
2. **অরূপ কুমার খাঁ** গ্রাম+পোস্ট—একবর্ণা জেলা—মালদা।
3. **সৌমেন চ্যাটার্জী** 176/4, শিবপুর রোড হাওড়া—711102
4. **শমিত প্রামাণিক** 55,কে. পি. চট্টরাজ রোড, গোরাবাজার বহরমপুর জেলা—মুর্শিদাবাদ—742101
5. **লিপি চক্রবর্তী** 122/B, জি. টি. রোড, বালী, জেলা—হাওড়া।

সেপ্টেম্বর '88-এর প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **নৈমিনাথ গাঙ্গুলী**, 36, বেকারী রোড বেলঘড়িয়া কলকাতা—700010
2. **তন্ময় মহাপাত্র** 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা-700010
3. **সুপ্তজিৎ সেনগুপ্ত** প্রযত্নে, মলয় কুমার সেনগুপ্ত আর, কে. মিশন অসম।

সেপ্টেম্বর '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **অতনু শেঠ** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু গলি পোস্ট—বাঁশবেড়িয়া জেলা—হুগলী।
2. **পূর্ণিমা রায়** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম—উটপাথর পোস্ট—নিমপুরা জেলা—মেদিনীপুর।
3. **সোনালী পিলসীমা** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 54, গৌরাঙ্গতলা খাগড়া, মুর্শিদাবাদ পিন—742103

সেপ্টেম্বর '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড়-II-এর সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

24-পরগনা ঃ মিঠু ঘোষ।
বর্ধমান ঃ সুমন গুপ্ত।

সেপ্টেম্বর '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে একজন মাত্র পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **রুনু নিয়োগী** প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী গ্রাম—পানপুর পোস্ট—নারায়ণপুর জেলা—উঃ 24-পরগনা পিন—743127

শারদীয় সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কার পাবে ঃ

1. **প্রথম ঃ অরিন্দম চন্দ্র** (পনেরটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) ফ্ল্যাট নং B/2, ক্লাস্টার-II পূর্বাচল, সেক্টর-3 সল্টলেক, কলকাতা-91
2. **দ্বিতীয় ঃ হিমাচল মুখার্জী** (পনেরটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, চণ্ডীদাস মুখার্জী স্কুলডাঙ্গা পোস্ট + জেলা বাঁকুড়া
3. **তৃতীয় ঃ** a) **তন্ময় মহাপাত্র** (চোদ্দটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা—700010

   b) **সৌরভ কুমার দে** (চোদ্দটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 113/2, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা—700010

শারদীয় 88-তে প্রকাশিত বুদ্ধিশুদ্ধি প্রতিযোগিতায় দুটি ছকের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা আগামী তিন বছরের জন্য বিনামূল্যে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রাহক হবে ঃ

1. **বাণী মিত্র** প্রযত্নে সনাতন ব্যানার্জী তারকেশ্বর—বি. পি. আর গেট হুগলী—712410
2. **সুমন্ত কুমার ঘোষ** প্রযত্নে, সুশান্ত শেখর ঘোষ গ্রাম—তিলকুড়িয়া পোস্ট - মহিষগড়িয়া বর্ধমান—712402
3. **প্রদীপকুমার পাল** 167/2, কে. জি আর, এস, পথ পূর্বাচল পল্লী পোস্ট - এঙ্গাস, জেলা—হুগলী—712221
4. **পার্থ প্রতিম ধাড়া** প্রযত্নে, অরুণ কুমার ধাড়া পোস্ট—তারকেশ্বর জেলা—হুগলী
5. **অরিন্দম চন্দ্র** ফ্ল্যাট নং—B/2, ক্লাস্টার-IJ পূর্বাচল, সেক্টর – 3 সল্টলেক, কলকাতা—700091
6. **সরজিৎ কুমার প্রামাণিক** পোস্ট—ডোমজুড় গ্রাম—জয়চণ্ডীতলা হাওড়া—711405
7. **ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী** ফ্ল্যাট—A-6 ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি টিচার্স কোয়ার্টার্স P-1/7 সি. আই. টি স্কিম-VII M কলকাতা—700055
8. **শান্তনু শাসমল** প্রযত্নে, পি সি. শাসমল গ্রাম—বাসুদেবপুর (গিরিশ মোড়) খঞ্জনচক, জেলা – মেদিনীপুর
9. **অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়** নফর শ্রীমানীর বাড়ি পাতপাড়া, মাকড়দহ, হাওড়া—711409
10. **হিমাচল মুখার্জী** প্রযত্নে, চণ্ডীদাস মুখার্জী স্কুলডাঙ্গা, পোস্ট + জেলা বাঁকুড়া

শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 88 প্রকাশিত সুপার আই-কিউ টেস্ট-এর সঠিক উত্তর আশানুরূপ না হওয়ায় কোন প্রতিযোগিকেই পুরস্কৃত করা সম্ভব হলো না।

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

ডিসেম্বর '88 সংখ্যার

ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **অমরনাথ রায়ের নলেজ ক্যুইজ**

গ্রেড-2 **বিমান বসুর নক্ষত্র পরিচয়**

গ্রেড-3 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল মানুষের কাহিনী**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..........................

....

বাড়ির ঠিকানা.....................

....

বয়স................ শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

কম খরচে হাই ভোল্টেজ

দেবকুমার রায়

উপকরণ ঃ

1. ট্রানজিস্টার AC128 অথবা AC188
2. ট্রান্সফরমার (ট্যাগ এলিমিনেটর 6-0-6)
3. কনডেনসার (c) 150μfd/16 Vwde Electrolytic
4. রেজিট্যান্স (R) 2KQ
5. সাধারণ অন, অফ সুইচ (অ্যাঙ্কার কোম্পানির)
6. 1·5 ভোল্টের একটা ব্যাটারি
7. 16 watt এর একটা বাল্ব (L), 8. সুইচ (S) একটা।

পদ্ধতি ও প্রস্তুত প্রণালী

আজ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের আগ্রহী মডেল নির্মাতাদের একটা নতুন ধরনের মডেলের কথা বলছি। কিভাবে $1\frac{1}{2}$ Volt এর একটা ব্যাটারী থেকে 15-16 walt এর একটা বাল্বকে 4-5 ঘণ্টা জ্বালানো যায় তারই একটা পদ্ধতি হলো এটি। খুব কম খরচে (15 টাকার মধ্যে) এটি বানিয়ে ক্ষুদে মডেল বিজ্ঞানীরা আনন্দ পাবে বলে আশা রাখি।

চাঁদনি চক বা ম্যাডান স্ট্রীটের যে কোন দোকান থেকে উপকরণগুলি কিনতে পাওয়া যাবে। উপরের সার্কিট ডায়াগ্রামে যথাসম্ভব সহজ করে দেখানো সংযোগ করার প্রণালী দেখে সোল্ডারিং করো। উল্লেখ্য ট্রানিজিস্টারের (Base Emiter Collecton) ঠিকমতন বসাতে হবে, না হলে ওটি অ্যাসিলেটার হিসাবে কাজ করবে না।

এবারে উপরের ছবি অনুয়ায়ী ব্যাটারী সংঘোগ করো এবং ট্রান্সফরমারের মুক্ত প্রান্তদুটিতে 16 watt এর বাল্ব যুক্ত করে ও সুইচ অন করে দেখ তোমার তৈরি মডেল লোডশেডিং এর সময় কি দারুণ কাজ দেয়।

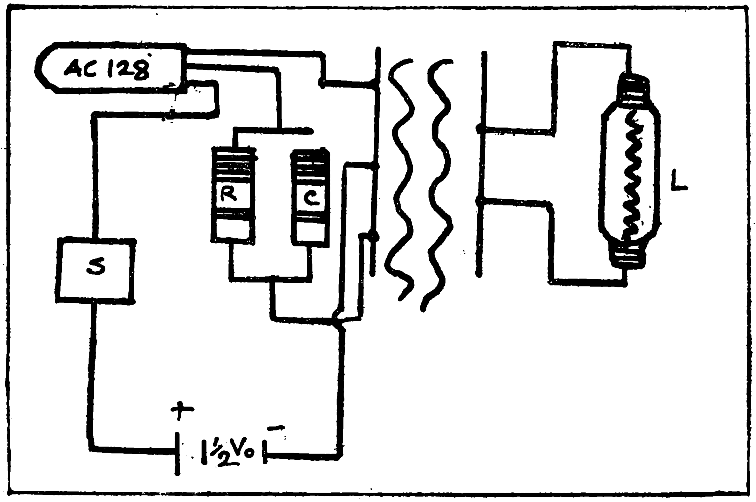

10/3এ শত্রুঘ্ন ঘোষ লেন কলিকাতা-7,00,012

ব্যাটারী চার্জার

রাজা মুখার্জী ও আদিত্য মণ্ডল

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

1. ট্রান্সফরমা→সেকেণ্ডারি ট্রান্সফরমা—12-0-12 প্রাইমারি 230 V to 6-0-6 } একটি
2. ডায়োড—4005 দুটো ও 4005 দুটো
3. থ্রিপোল সুইচ একটি

থাকবে CT অর্থাৎ ঋণাত্মক পয়েন্ট (—)। নিচের দিকে থাকবে দুটো পয়েন্ট 6V এবং 6V।

এবার সার্কিট দেখে ঠিক করে ঝাল দিয়ে যন্ত্রগুলো সাজিয়ে ফেল। থ্রিপোলের সুইচটার মাঝখান থেকে প্লাস পয়েন্ট বের হবে। আর একপাশে 12V-এর তার ও একপাশে 6V-এর তার ঝালাই করতে হবে। ব্যাস কাজ শেষ।

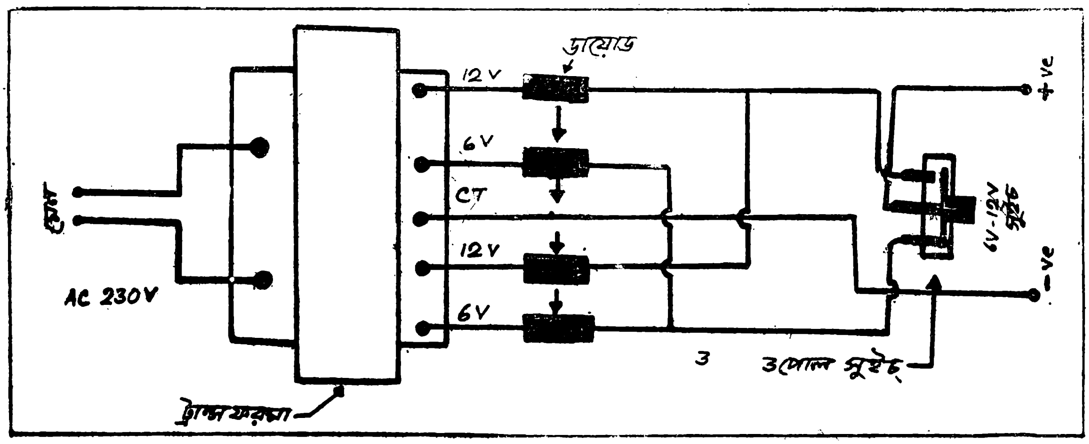

এছাড়া কিছু তার স্ক্রু ঝাল এবং যন্ত্রাংশ ফিটিংস করার জন্য একটি কাঠের পাটাতন বা বাক্স।

ছোট্ট বন্ধুরা আজ তোমাদের এমন একটি জিনিস তৈরি শেখাবো যার সাহায্যে তোমরা 6V এবং 12V ব্যাটারি অনায়াসে চার্জ দিতে পারবে।

এবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলো কিনে নাও।

ট্রান্সফরমার একদিকে থাকবে দুটো পয়েন্ট। AC230 V-এর জন্য। এবং অপর দিকের উপরে থাকবে তিনটি পয়েন্ট। দুটো দুপাশে 12V-এর জন্য আর মাঝখানে

এবার সিরিজ লাইনে টেস্ট করো। পরে ডাইরেক্ট লাইনে টেস্ট করবে। খুব সাবধান, দেখবে যেন AC 230V-এর লাইনের তার গুলো একহয়ে যায় না বা 6V এবং 12V তার এক হয়ে যায় না।

কাজটি করতে সফল হলে বা কাজটিতে কোন রকম অসুবিধা দেখা দিলে নীচের ঠিকানায় যোগা যোগ করো।

কাঁন্দোর সোনা, শক্তিগড়, বর্ধমান
সিঙ্গুর বি. ডি. ও, সিঙ্গুর হুগলী

বলতে পারো কেন?

সুধাংশু পাত্র

[মে-৪৪ সংখ্যায় প্রশান্ত পালের প্রশ্ন "নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে মাথা ন্যাড়া করার সংস্কারটা কী কুসংস্কার নয়?" প্রশ্নটির উত্তরে খুশি হতে না পেরে জনৈক "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাঠক" উত্তরটি "বিজ্ঞানভিত্তিক" না হওয়ার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েছেন ধ্যানেশ্রী মুখার্জি—চন্দননগর, হুগলি থেকে।

প্রথমতঃ আপনারা প্রশ্নগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যে কোন সমালোচনাকে আমরা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করি। কারণ, আপনারা সমালোচনা না করলে আমরা নিজেদের সংশোধন কেমন করে করবো এবং পত্রিকার মানই বা উন্নত হবে কেমন করে? আমরা যত অভিজ্ঞ হইনা কেন, পৃথিবীর জ্ঞান সমুদ্রের কতটুকু জল আমরা পান করেছি বলুন? পল্লব গ্রাহী যাকে বলে আমরা ঠিক তাই। অতএব ত্রুটি থাকবেই এবং আপনাদের সহৃদয়তাই ত্রুটি সংশোধন করবে। প্রশ্নটি সম্বন্ধে আপনাদের বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই যে, প্রশ্নটি বিজ্ঞানসম্মত কিনা প্রশ্নকর্তা জানতে চায়নি। জানতে চেয়েছিল এটি কুসংস্কার কিনা? আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, আজও প্রত্যেকটি সমাজে মৃত্যুকে ঘিরে কিছু না কিছু সংস্কার প্রচলিত। আর মানুষের একমাত্র পরিচয় সে সামাজিক জীব। সমাজের আনুগত্য তাকে মানতে হয়। পত্রিকাটি আবার ছোটদের জন্য। আর ছোটদের জন্য লিখতে গেলেই অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। বিশেষ করে কাদার মত তুলতুলে এই সুন্দর মনগুলিতে যাতে বিন্দুমাত্র অপরাধ প্রবণতা প্রবেশ না করে কিংবা অসহিষ্ণু না হয়ে উঠে তার জন্য প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। বড়দের পত্রিকা হলে কিংবা বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানতে চাইলে আপনাদের উত্তরকে স্বাগত জানাতাম। বিতর্কিত জেনেও এই সংখ্যায় আরও কিছু সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল, আশা করবো, এবারেও আপনারা মতামত রাখবেন।]

গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নির্বাচিত প্রশ্ন
"ভু-পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে বায়ুচাপ কম কেন"র উত্তর

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই একটি অংশ। পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্যই বায়ুমণ্ডলটি সে ধরে রাখতে পেরেছে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের ওজন আছে এবং বায়ুমণ্ডলের নিজস্ব ওজনের জন্যই ওর মধ্যে চাপের সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত—এমন কল্পনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, প্রত্যেকটি স্তরকে তার উপরের স্তরগুলোর ওজন বহন করতে হয়। সর্বনিম্নের স্তরকে আবার উপরের স্তরগুলোর সম্মিলিত ওজন বহন করতে হচ্ছে। আর ঐ কারণেই নিচের স্তর গুলোর চাপ এবং সেই সঙ্গে ঘনত্ব অধিক। বায়ুর ঘনত্ব অল্প হওয়ায় সামান্য দু এক মিটার গভীরতার হ্রাসবৃদ্ধিতে খুব একটা তারতম্য হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 250 মিটার উর্ধ্বে বায়ুর চাপ মাত্র 30 মিলিমিটারের মত হ্রাস পায়।

এ মাসের প্রশ্ন ঃ
একটি শক্তিশালী চুম্বকের উত্তর মেরুকে অতি দ্রুত একটি দুর্বল চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আনলে বিকর্ষণের পরিবর্তে আকর্ষণ হয় কেন?

নিখিল রঞ্জন বালা, সোনারপুর, 24-পরগণা।

প্রঃ সমুদ্রের জল লোনা কেন? জানতে চেয়েছো জুড়াপানি জলপাইগুড়ি থেকে নারায়ণ চন্দ্র দাস ও বামনসরিয়া, লালনগর, মেদিনীপুর থেকে সঞ্জীব কুমার মণ্ডল। তোমাদের উত্তরের জন্য জানুয়ারী ৪৪ সংখ্যাটি দেখ।

উঃ কাঁচা আম টক, পাকলে মিষ্টি হয় কেন—জানতে চেয়েছো হায়দার আলি, কাশিমবাজার—বীরভূম থেকে। তোমার প্রশ্নটির উত্তরও কিছুদিন আগে দেওয়া হয়েছে।

প্লানচেট সম্বন্ধে মানস মজুমদার—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর থেকে আরও কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংযোজন করেছেন। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবো।

B. M. R. এর পুরো নাম "বেসাল মেটবলিক রেট"ই ঠিক। ভুল ক্রমে বেসাল এর পরিবর্তে বেস ছাপানো

হয়েছে। সংশোধন করিয়ে দিয়েছেন—নাজমুর জামান, কলসুর 24 পরগণা থেকে।

বেলঘরিয়া, কলিকাতা-83 থেকে পাপিয়া পাল ব্লিচিং পাউডার সম্বন্ধে সঠিক উত্তরটি দিয়েছো।

জোনাকির আলো সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছো লক্ষ্মীকান্ত বসু —গোবরা, চণ্ডীতলা, হুগলী থেকে এবং নজরুল ইসলাম সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ থেকে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তর জুলাই 88 সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

চুল পাকলে কেন সাদা হয় –জানতে চেয়েছো রণজিৎ ধর –নিউ বনগাইগাঁও 35/সি বি. জি. কলোনী থেকে। "ঘুম আসে কেন এবং ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি কেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন এসেছে। (1) পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 64/5 পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-37 থেকে, (2) সম্বিত সোম—শিবতলা রোড, বালুরঘাট দিনাজপুর থেকে, (3) শ্যামল সেন —ইন্দা' খড়্গপুর থেকে।

মাত্র কিছুকালের ব্যবধানেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। সময়মত আবার আলোচনা করা হবে।

এবার নিয়মিত প্রশ্নোত্তরের আসরে আসা যাক।

প্রঃ বাদুড়েরা অন্ধকারে কীভাবে যাতায়াত করতে পারে? দেবমাল্য রায়। শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

উঃ অন্ধকারে যাতায়াত করা বাদুড়দের একটি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। ওদের দৃষ্টিশক্তি অতীব ক্ষীণ—'দিনে ও রাতে কোন সময় ভাল দেখতে পায় না। তথাপি ওরা অন্ধকারে মাইলের পর মাইল ছুটে যেতে পারে এবং ফিরেও আসে নির্ভুল পথে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সিদ্ধান্তে এসেছেন, বাদুর ওড়ার সময় এক-রকম শব্দ সৃষ্টি করে—যা শব্দোত্তর তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণভাবে শ্রুতিগোচর না হলেও প্রতিফলকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে এলে তাদের দেহের সর্বাধিক অনুভূতি সম্পন্ন শিরা এবং দেহের অনুপাতে অনেক বড় তাদের কানে ধরা পড়ে। আর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই তারা কোথায় কী আছে তা নির্ণয় করে নিতে পারে এবং অক্লেশে যাতায়াতও করতে পারেন।

প্রঃ। মাকড়সার জালে মশা মাছিরা আটকায় কিন্তু মাকড়সারা নিজেরা আটকে যায় না কেন? (1) মোঃ ওমর আহম্মদ—সৈদপুর, টাকি, 24-পরগণা। (2) অভিজিৎ মুখার্জী, 89/1 ভি. কে. নগর—দুর্গাপুর-10।

উঃ মাকড়সাদের পায়ে একধরণের পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় ফাই ব্রাইন নামে প্রোটিন যুক্ত চটচটে নিজেদের জালে নিজেরা আটকায় না।

প্রঃ। চড়ুই পাখীরা মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে সারা গায়ে ধুলো মাখে কেন? রবীন কুমার ব্যানার্জী, কুবুই, বর্ধমান।

উঃ পাখীদের গায়ে এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উকুন বাস করে। ওরা পরভোজী। গা থেকে উকুনদের ঝাড়তে তারা পাখার সাহায্যে ধূলোর ঝাপটা লাগায়। এ যেন অনেকটা বালির স্রোতে ধাতব জিনিসকে সাফ করার কারিগরি। অপরদিকে পাখীরা বেশ সৌখিনও। ময়লায় ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু ময়লাকে গায়ে লাগতে দেয় না। গায়ে ময়লা লাগলে ধূলাবালি মেখে এবং ঝাড়পোঁছ করে পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, জলে স্নান করতে চায়, লেজের গোড়ার তৈলগ্রন্থি থেকে ঠোঁটে করে তেল এনে পালক মার্জনা করতে চায় এবং পালকের ঝালরগুলো খুলে গেলে ঠোঁট দিয়ে বিন্যস্ত করতে চায়।

প্রঃ। আর্কিওপটেরিক্স কী জীবন্ত প্রাণী। এর মধ্যে কোন্ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? শ্যামল কান্তি মান্না, কুমিরঘোড়া, হুগলী।

উঃ আর্কিওপটেরিক্স কোন জীবন্ত প্রাণী নয়। আজ থেকে অন্ততঃ সাত কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষভাগের দিকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাখী ও সরীসৃপের মাঝামাঝি ওরা। বিবর্তনের ধারায় জলে, স্থলে ও আকাশে অবাধ বিচরণকারী ডাইনোসোরদের বংশধর টেরাডাকটাইলদের কাছ থেকে এসেছিল। আকাশে উড়তে পারলেও পাখী ছিল না টেরাডাকটাইলরা। বাদুড়ের ডানার মত ছিল ডানা, বৃহৎ চঞ্চু ছিল এবং চঞ্চুতে ছিল দাঁত।

আর্কিওপটেরিক্স

বিবর্তনের ধারায় আর্কিওপটেরিক্সরা ওদের কাছ থেকে এলেও প্রথম ডানায় পালক আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও চঞ্চুতে দাঁত ছিল, তবু বিজ্ঞানীদের মতে ওরা পাখীদের পূর্বপুরুষ। আকারেও ছিল বেশ বড়। লুপ্ত এই প্রাণীটির জার্মানী ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে চুনাপাথরের উপর যে ছাপটি পাওয়া গেছে, সেটি প্রদর্শিত হয়েছে ছবিতে।

প্রঃ। কাক চালাক। তবু কোকিলের কাছে বোকা বনে যায় কেমন করে? বিমল সামন্ত ও শিবাজী বেজ, মণ্ডেশ্বর, বর্ধমান।

উঃ নিশ্চয়ই কোকিলের ডিমপাড়ার কথাটা বলতে চেয়েছো? পশুপাখীর জগৎটা বড় বিস্ময় কর। আত্মরক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ, বিশেষ করে বংশ বিস্তারের বেলায় ওরা এমন বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় প্রদান করেছে, রূপকথার গল্পকেও যেন

হার মানায়। কোকিল বাসা বাঁটতে পারে না, তাই কাকের বাসায় কাকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ডিমপাড়ার বুদ্ধি তাদের সহজাত। শুধু কোকিল নয়, এমন এক ধরণের বোলতা আছে—যারা অতি ধূর্ত ও হিংস্র শিকারী বোলতার গর্তে গিয়ে তাদের ডিমকে খেয়ে নিজে ডিম পেড়ে পূর্বের মত গর্তের মুখকে ঢাকা দিয়ে চলে আসে।

প্রঃ। প্রাণি জগতে এমন কোন প্রাণী কী আছে—যার পুরুষেরা সন্তান প্রসব করে? দীপক, উদয়, কাজলদি ও কাকুলি। রামচন্দ্রপুর, কয়ালপাড়া, বজবজ।

উঃ জীববিজ্ঞানে যারা সন্তান প্রসব করে তাদেরই 'স্ত্রী' বলা হয়। কোন পুরুষ সন্তান প্রসব করতে পারে না। তবে এক আধটু ব্যতিক্রম নিম্নশ্রেণীর অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে দেখা যায়। ওদের অনেকে উভলিং। অথাৎ তাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। যেমন আমাদের পরিচিত শামুকরা। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। দুজনেই অ্যান্টেনা জোড়া পরস্পর যুক্ত করে—যেন ভাব বিনিময় করে ওরা তারপর দুজনের পেটেই ডিম হয় এবং দুজনেই ডিম পাড়ে। ওদের কে পুরুষ আর কে স্ত্রী কেমন করে বলা যায় বল! (পাশের চিত্র)

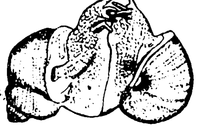

প্রঃ। কোন্ প্রাণী জীবনে জলপান করে না? জলপান না করে ওরা কেমন করে বেঁচে থাকে? মোঃ হানিফ সেখ। ...গোলা, ধূলাডিড়ি হাট।

মরু অঞ্চলে জল দুষ্প্রাপ্য এবং বৃষ্টিপাতও ঘটে কালেভদ্রে। তাই মরু অঞ্চলের বাসিন্দারা অনেকে দীর্ঘকাল জলপান না করে বেঁচে থাকে। সারা জীবনে একবারও জল পান করার প্রয়োজন হয় না—এমন একটি জীব মেক্সিকোর মরুভূমির বাসিন্দা কাঙ্গারু র‍্যাট নামে একটি বিরল প্রাণী। আশ্চর্য ধরণের এই প্রাণীটি গর্তবাসী, নিশাচর, আকারে ধেড়ে ইঁদুরের মত, মার্সুপিয়াল বর্গের অঙ্কগর্ভ প্রাণী। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ার আজব প্রাণী কাঙ্গারুদের মত ওরা অপুষ্ট সন্তান প্রসব করে এবং বাচ্চা পরিণত না হওয়া পর্যন্ত পেটের তলায় থলিতে পালন করে। তাই এমন নামকরণ।

জীব বিজ্ঞানীদের মতে ওদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় জল তাদের খাদ্য থেকেই সংগ্রহ করে নেয়। এটিও তাদের একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়া। যেহেতু যে কোন প্রাণীর খাদ্য এক একটি জৈব যৌগ এবং প্রতিটি জৈব যোগে হাইড্রোজেন অবশ্যই থাকে। ওরা খাদ্য থেকে যে টুকু হাইড্রোজেন লাভ করে তার সবটারই ওদের দেহে জারিত হয় এবং উৎপন্ন করে জল। আর ঐ জলই তাদের চাহিদা মেটায়।

ওদের দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থের আকারে জলের বেরিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই। মল অত্যন্ত শক্ত এবং মূত্র অতিশয় গাঢ়। ঘন ঘন মূত্রত্যাগও করে না। ওতে যেটুকু জল বেরিয়ে যায় তার পরিমাণ অতি সামান্য। অপর দিকে অন্যান্য প্রানীদের মত ওরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্পও আদৌ ত্যাগ করে না। দেহত্বকের এমনই গঠন যে, পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলে দৈহিক তাপমাত্রারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। তাই শীতে, গ্রীষ্মে কোন অবস্থাতেই অস্বস্তি অনুভব করে না, আর জল পানের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না।

প্রঃ। কাল নাগিনীর কী বিষ আছে? যদি নেই তাহলে চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দর মরলো কেন? কাহিনীটি কী সত্য?

উঃ সর্পবিশেষজ্ঞরা বলেন, কালনাগিনী নির্বিষ সর্প। অর্থাৎ ওর বিষ নেই। অপরদিকে চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি একটি লৌকিক কাহিনী মাত্র। হয়ত কোন এক সময় সর্প-সঙ্কুল বাংলার কোন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্রের বিবাহের দিনে কোন এক বিষধর সর্প দংশন করেছিল এবং তাতে তার মৃত্যুও হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক কাহিনীটি হয়ত মনসামঙ্গলের উৎস। এমনও হতে পারে, 'কাল' কথাটা যুক্ত করে সাধারণ মানুষ কাল কেউটের মত কোন বিষধরকে নির্দেশ করতো—যা আজকের কালনাগিনী নয়।

সেকালে আবার বিয়োগান্ত কোন কাব্য রচনা করা নীতি বিরুদ্ধ ছিল। তাই পরে যখন কাহিনীটি কাব্যের পর্যায়ে আনা হলো তখনই মা মনসার কথা আসে এবং লখীন্দরের পূণর্জীবন লাভ হয়। মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেবও লখীন্দরের পুনর্জীবনলাভকে মনে হয় সত্য বলে মনে করেননি। তাই লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর চকিতে তাঁদের নিয়ে এসেছেন এবং জননীর সুখ স্বপ্নের মত মাত্র একেবারের জন্য ছদ্মবেশে হাজির করিয়েছেন বেহুলার মায়ের সামনে। তারপর সোজাসুজি চালান করে দিয়েছেন স্বর্গে।

অপর পক্ষে পুরুষকারের আদর্শ চাঁদসদাগর যদি দেবতার কুটিল চক্রান্তকে ব্যর্থ করাতে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাহলে বলতে হবে সেই বাসরঘরই লখীন্দরের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সেকালে লোহা অবশ্যই সহজলভ্য ছিল না এবং ঐ কারণে ঘরখানা নিশ্চয়ই খুব বড় মাপের করতে পারেননি। নিশ্ছিদ্র বাসর ঘরে দুটি মানুষ ছিলেন এবং সারারাত্রি ব্যাপী জ্বালানো হয়েছিল প্রদীপ। লখীন্দর ছিলেন শায়িত অবস্থায় এবং বেহুলা জেগে ছিলেন এবং রান্নাও করছেলেন। দুজনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, প্রদীপ ও জ্বালানী থেকে অক্সিজেনের ঘাটতি এবং উৎপন্ন ভারি গ্যাস

কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।

প্রঃ। বিধবারা যে একাদশী ও অম্বুবাচী পালন করেন, এর পেছনে কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে? শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটুলী, বর্ধমান।

উঃ না, কোন যুক্তি নেই। এটি পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার একটি হীন ও বর্বরোচিত বিধান। যাঁরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত উপবাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে চান, তাঁদের জানানো যায় যে—এই বিধান শুধু বিধবার ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য? আর কেনই বা বিশেষ তিথিতে? অন্য যে কোন সময়ে একবেলা বা সারাদিন উপবাস দিলে তো চলে।

প্রঃ। হাঁচি ও টিকটিকির শব্দ কী যাত্রাকালে অশুভের প্রতীক? প্রণজিৎ কর্মকার।

উঃ এগুলো এক একটি কুসংস্কার। কোন যুক্তি নেই। তাই এ গুলোকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রঃ। সাপের মাথায় কী মণি থাকে? ঝণ্টু চৌধুরী, চকবাহাৎপুর বর্ধমান।

উঃ না, এ শুধু কবির কল্পনা। মনি খনি থেকেই পাওয়া যায় উন্নত হীরক, কয়লার একটি রূপভেদ।

প্রঃ। V. D. O-র পুরো নাম কী? সুবীর সরকার, রাঘবপুর-পালপাড়া-নদীয়া।

উঃ এটি সংক্ষেপিত নাম নয়। শব্দটি Video। ল্যাটিন Videre শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "to see"।

বিজ্ঞান সংবাদ

রাজ্য ক্রীড়া ও যুবদপ্তর এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে কলিকাতা মেলা বিজ্ঞান মেলা

আগামী 9-12 ফেব্রুয়ারি 1988 রাজ্য ক্রীড়া ও যুবদপ্তর এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিজ্ঞান মেলায় আকর্ষণীয় প্রদর্শনী ও বিবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কোন প্রবেশ মূল্য লাগবে না। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগ করতে হবে:

বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম
19A গুরুসদয় রোড, কলকাতা 19

মুর্শিদাবাদ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ মাস উদযাপন

10ই সেপ্টেম্বর থেকে 10ই অক্টোবর 1988

পশ্চিম বঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, মুর্শিদাবাদ জিলা অ্যাডহক্ কমিটির উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, নিউটন সায়েন্স ক্লাব, ইউথ অ্যাসোসিয়েশন অফ্ সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজির সহযোগিতায় "বিজ্ঞান জনপ্রিয় করণ মাস" উপলক্ষে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় এক মাস ব্যাপী 19টি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এই সব অনুষ্ঠানে মুলতঃ কুসংস্কার বিরোধী বক্তব্য' বক্তৃতা, হাতে কলমে শিক্ষা, চার্ট, পোস্টার, ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া "বিজ্ঞান যে সবার" এই মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে নানা ধরনের বিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয় ছোট ছোট খেলা ও সহজ সরল পরীক্ষার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে পরি-বেশিত হয়।

এই অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণে শ্রীমতী রীনা দত্ত, বিমলাক্ষী ঘোষাল, সৈয়দ রিয়াজ কাদির, নীলাদ্রী মজুমদার, মানস মজুমদার, মানব মজুমদার, অপূর্ব দাস, প্রদীপ ঘোষ, সজল দাস, ভবানী বিশ্বাস, ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ মিহির দত্ত, ধরাপতী শিকারী, ঝুমুর দত্ত, ইলা শিকারী, সাগর দত্ত, রবীন্দ্র নাথ হালদার, পুলক পাল, শ্যামল হালদার, রজতাভ হালদার, বিশ্বনাথ দাস, গৌতম বোস, সুজয় চক্রবর্তী, রাজা মুখার্জি, তাপস বিশ্বাস, আশুতোষ মিত্র, হরিহর সাহা, জেয়ার আহমেদ, শাকাভোয়াত আলি, ভবেশ ঘোষ, এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই অনুষ্ঠান গুলি সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ ভাবে সাড়া জাগায় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের আরো অনুষ্ঠান করার জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানকারী সংস্থা গুলি আমন্ত্রিত হয়।

সি ভি রমন জন্মশতবার্ষিকী

এক-বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। এই কৃতী বিজ্ঞানীর জীবন ও গবেষণা এবং সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংবাদ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 10

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

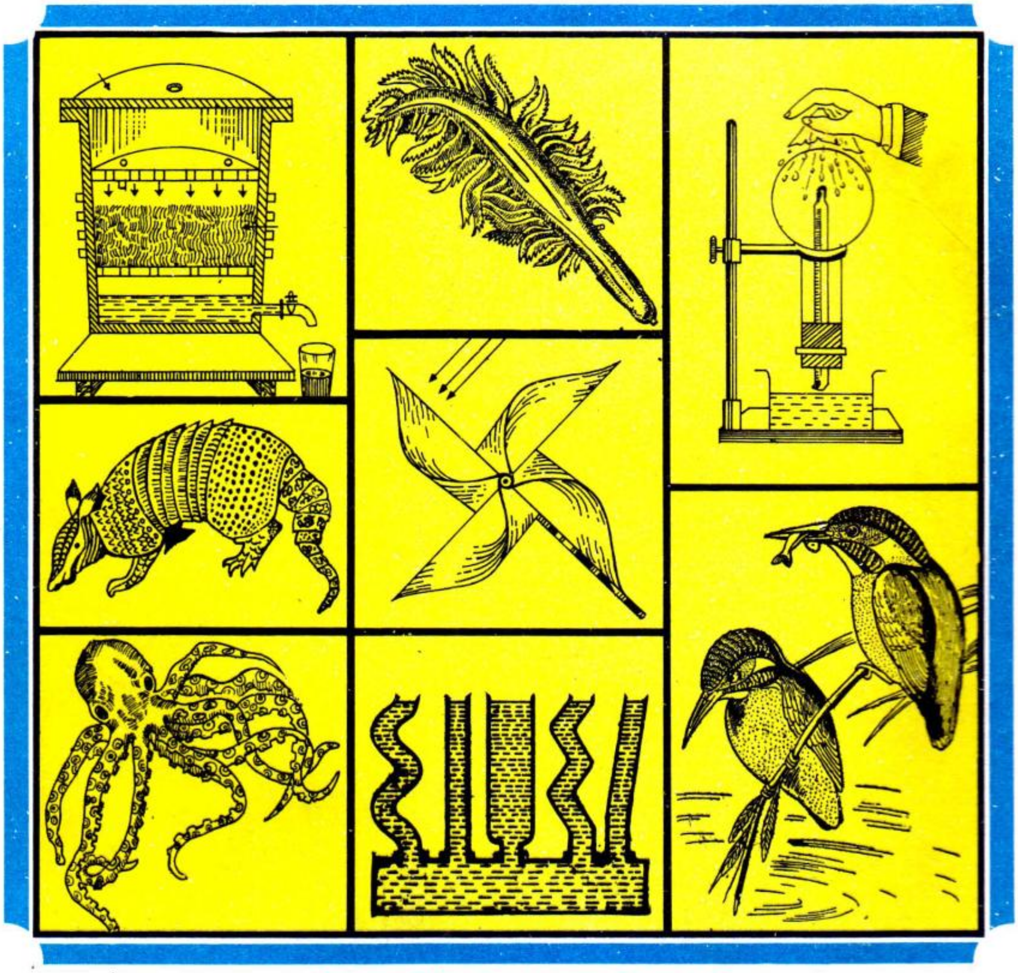

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·50 টাকা।